তিন গোয়েন্দা
ভলিউম ৫৮
রকিব হাসান
কিশোর থ্রিলার
সেবা
প্রকাশনী
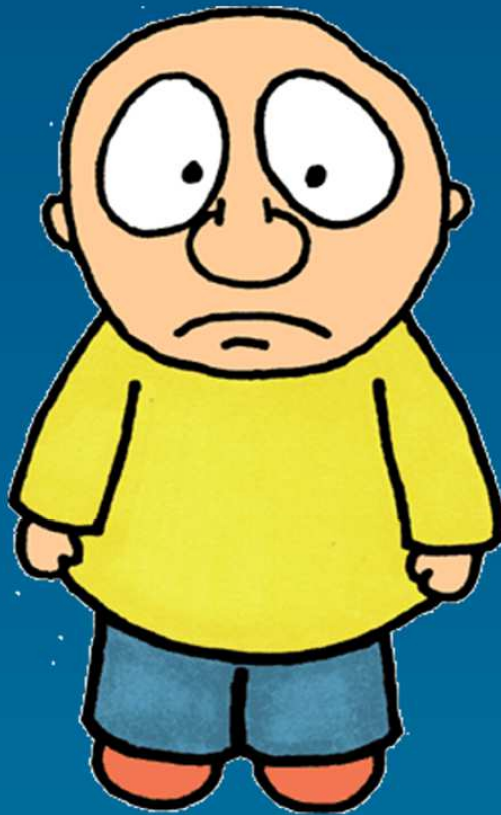
ভলিউম-৫৮

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী

পঁয়ত্রিশ টাকা
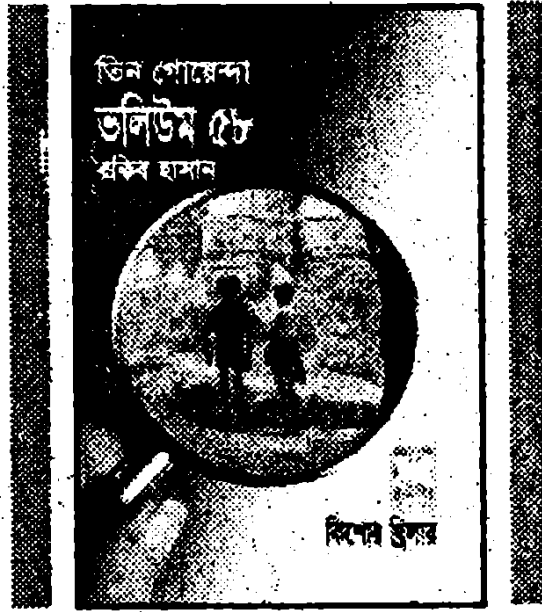
ISBN 984-16-1518-5

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ ২০০৪

রচনা বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি পি ও বক্স ৮৫০
E-mail sebaprok@citechco.net

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭১৮ ১৯০২০৩

Volume-58
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan

মোমের পুতুল ৫-৬০
ছবিরহস্য ৬১-১০০
সুরের মায়া ১০১-১৪৪

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ৪০ (অভিশপ্ত লকেট, গ্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন অ্যালিগেটর) ৪২/-
তি. গো. ভ. ৪১ (নতুন স্যার, মানুষ ছিনতাই, পিশাচকন্যা) ৪৩/-
তি. গো. ভ. ৪২ (এখানেও ঝামেলা, দুর্গম কারাগার, ডাকাত সর্দার) ৪১/-
তি. গো. ভ. ৪৩ (আবার ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৪ (প্রত্নসন্ধান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদখল) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৪৫ (বড়দিনের ছুটি, বিড়াল উধাও, টাকার খেলা) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৬ (আমি রবিন বলছি, উল্কির রহস্য, নেকড়ের গুহা) ৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪৭ (নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাত্রা) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৮ (হারানো জাহাজ, শ্বাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৯ (মাছির সার্কাস, মঞ্চভীতি, ডীপ ফ্রিজ) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৫০ (কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৫১ (পেঁচার ডাক, প্রেতের অভিশাপ, রক্তমাখা ছোরা) ৩৭/-
তি. গো. ভ. ৫২ (উড়ো চিঠি, স্পাইডারম্যান, মানুষখেকোর দেশে) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৫৩ (মাছেরা সাবধান, সীমান্তে সংঘাত, মরুভূমির আতঙ্ক) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৫৪ (গরমের ছুটি, স্বর্গদ্বীপ, চাঁদের পাহাড়) ৩৭/-
তি. গো. ভ. ৫৫ (রহস্যের খোঁজে, বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা, টাক রহস্য) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৫৬ (হারজিত, জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা, ইলেট্রনিক আতঙ্ক) ৩০/-
তি. গো. ভ. ৫৭ (ভয়াল দানব, বাঁশিরহস্য, ভূতের খেলা) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৫৮ (মোমের পুতুল, ছবিরহস্য, সুরের মায়া) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৫৯ (চোরের আস্তানা, মেডেল রহস্য, নিশির ডাক) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬০ (শুঁটকি বাহিনী, ট্রাইম ট্র্যাভেল, শুঁটকি শত্রু) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬১ (চাঁদের অসুখ, ইউএফও রহস্য, মুকুটের খোঁজে তি. গো.) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬২ (যমজ ভূত, ঝড়ের বনে, মোমপিশাচের জাদুঘর) ৩৩/-
তি. গো. ভ. ৬৩ (ড্রাকুলার রক্ত, সরাইখানায় ষড়যন্ত্র, হানাবাড়িতে তিন গোয়েন্দা) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৬৪ (মায়াপথ, হীরার কার্তুজ, ড্রাকুলা-দুর্গে তিন গোয়েন্দা) ৩৭/-
তি. গো. ভ. ৬৫ (বিড়ালের অপরাধ+রহস্যভেদী তিন গোয়েন্দা+ফেরাউনের কবরে) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬৬ (পাথরে বন্দী+গোয়েন্দা রোবট+কালো পিশাচ) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬৭ (ভূতের গাড়ি+হারানো কুকুর+গিরিগুহার আতঙ্ক) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬৮ (টেরির দানো+বাবলি বাহিনী+শুঁটকি গোয়েন্দা) ৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬৯ (পাগলের গুপ্তধন+দুখী মানুষ+মমির আর্তনাদ) ৩৪/-
তি. গো. ভ. ৭০ (পার্কে বিপদ+বিপদের গন্ধ+ছবির জাদু) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৭১ (পিশাচবাহিনী+রত্নের সন্ধানে+পিশাচের থাবা) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৭২ (ভিনদেশী রাজকুমার+সাপের বাসা+রবিনের ডায়েরি) ৪১/-
তি. গো. ভ. ৭৩ (পৃথিবীর বাইরে+ট্রেইন ডাকাতি+ভুতুড়ে ঘড়ি) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৭৪ (কাঁওয়াই দ্বীপের মুখোশ+মহাকাশের কিশোর+ব্রাউন্সভিলে গণ্ডগোল) ৪৪/-
তি. গো. ভ. ৭৫ (কালো ডাক+সিংহ নিরুদ্দেশ+ফ্যান্টাসিল্যান্ড) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৭৬ (মৃত্যুর মুখে তিন গোয়েন্দা+পোড়াবাড়ির রহস্য+লিলিপুট-রহস্য) ৩৯/-
তি. গো. ভ. ৭৭ (চ্যাম্পিয়ান গোয়েন্দা+ছায়াসঙ্গী+পাতাল ঘরে তিন গোয়েন্দা) ৪৩/-
তি. গো. ভ. ৭৮ (চট্টগ্রামে তিন গোয়েন্দা+সিলেটে তিন গোয়েন্দা+মায়াশহর) ৩৭/-
তি. গো. ভ. ৭৯ (লুকানো সোনা+পিশাচের ঘাঁটি+তুষার মানব) ৩৬/-

মোমের পুতুল

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৫

স্কুল ছুটি। আবার টিটুকে নিয়ে গ্রীনহিলসে বেড়াতে এসেছে কিশোর পাশা।

মুসাদের বাগানের কোণে ছাউনিতে পাঁচ গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টার। সেখানে বসে আড্ডা দিচ্ছে ওরা।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'ঝামেলার খবর কি?'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে রবিন জবাব দিল, 'খুব তো ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে আজকাল। শুনেছি অনেক চুরি-ডাকাতি হচ্ছে, সেগুলোর তদন্ত করছে বোধহয়।'

'চুরি তো হচ্ছে অন্য এলাকায়, গ্রীনহিলস থেকে অনেক দূর পত্রিকায় পড়েছি। গত হপ্তায় মিসেস কক্‌লসের অনেক দামের গহনা চুরি হয়েছে। তার আগের হপ্তায় চুরি হয়েছে আরেকজন বিখ্যাত মানুষের বেশ কিছু হীরা। চোরের কোন হদিস করতে পারেনি পুলিশ। তাদের ধারণা কোন সংঘবদ্ধ দলের কাজ। যদ্দূর জানি, গ্রীনহিলসে উৎপাত এখনও শুরু হয়নি।'

'হলেই ভাল হত,' ফারিহা বলল। 'আমরা ওদের ধরতে পারতাম। ছদ্মবেশ নিয়ে ওদের পিছু নিতে তুমি। ওদের আস্তানা কোথায় জেনে আসতে। তারপর ধরা যেত।'

রবিন বলল, 'মনে হচ্ছে অনেক বড় দল। নজর রাখার জন্যে নিশ্চয় অনেক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।'

'আমরাও নজর রাখতে পারি না?' ফারিহা বলল। 'কোথাও হয়তো দলটাকে দেখে ফেললাম…'

'গাধা নাকি,' মুখ ভেঙচে বলল মুসা। 'যেন দল বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকবে রাস্তার মোড়ে, আর বলবে আমরা চোর, আমরা চোর, আমাদের ধরো!'

হতাশ হলো না ফারিহা। বলল, 'আচ্ছা, ক্যাপ্টেন রবার্টসনের কাছে তো যেতে পারি আমরা। জিজ্ঞেস করতে পারি কোনো রহস্য আছে কিনা। পুলিশের লোক, অনেক রহস্যের কথা জানা থাকতে পারে।'

'হ্যাঁ, এই কাজটা করতে পারি,' একমত হলো রবিন। 'পুলিশকে অনেক সাহায্য করেছি আমরা। আশা করি ফিরিয়ে দেবেন না।'

কিশোর বলল, 'এইটা সত্যি ভাল বুদ্ধি। ঝামেলা কোন কাজে ব্যস্ত, নিশ্চয়

তিনি জানেন। হয়তো বলবেন আমাদের।'

সুতরাং পরদিন সকালে উঠেই পুলিশ হেডকোয়ার্টারে চলল গোয়েন্দারা, যেখানে ক্যাপ্টেন রবার্টসনের অফিস। অফিসে ঢুকে ডেস্কে বসে থাকা একজন পুলিশকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করা যাবে?'

'ক্যাপ্টেন!' ভুরু কোঁচকাল লোকটা। 'অসম্ভব! তিনি এখন ব্যস্ত। দেখা করবেন না। যেতে পারো।'

এ রকম এক কথাতেই ভাগিয়ে দেবে, আশা করেনি গোয়েন্দারা। অনুরোধ করতে গেল কিশোর। এই সময় কোণের একটা টেবিল থেকে বলে উঠল আরেকজন পুলিশম্যান, 'তোমরা নিশ্চয় গ্রীনহিলস থেকে এসেছ? তোমাদের চিনি আমি। বেশ কয়েকটা জটিল রহস্যের কিনারা করে দিয়েছিলে তোমরা।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' তাড়াতাড়ি বলল কিশোর। 'আমরাই। তিনি ব্যস্ত থাকলে অবশ্য কোন কথা নেই। কিন্তু অত্যন্ত জরুরী একটা কাজে এসেছি আমরা। দেখা করতে পারলে ভাল হত।'

'তা হলে কি ক্যাপ্টেনকে গিয়ে বলব?' সহকর্মীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল প্রথম পুলিশম্যান।

'থাক, তুমি কাজ করো। আমিই যাচ্ছি।'

উঠে চলে গেল দ্বিতীয়জন।

উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল গোয়েন্দারা। দেখা করবেন তো ক্যাপ্টেন?

ফিরে এল পুলিশম্যান। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'দেখা করবেন। এসো আমার সঙ্গে।'

লম্বা একটা করিডর ধরে এগোল ওরা। সেটা পার হয়ে এসে পড়ল আরেকটা করিডরে। ভয়ে ভয়ে পুলিশম্যানের দিকে তাকাল ফারিহা। কয়েদখানার দিকে নিয়ে যাচ্ছে না তো, যেখানে কয়েদীরা থাকে?

করিডরের শেষ মাথায় একটা দরজার সামনে দাঁড়াল পুলিশম্যান। দরজাটার উপরের অংশ কাঁচে তৈরি। আস্তে ঠেলে খুলে ভেতরে উঁকি দিয়ে বলল, 'ওরা এসেছে, স্যার।'

কাগজপত্র আর ফাইলে বোঝাই বিশাল এক ডেস্কের ওপাশে বসে আছেন ক্যাপ্টেন। গোয়েন্দাদের দেখে হেসে বললেন, 'আরি, পুরো দলটাই যে। টিটুও চলে এসেছ। এসো, বসো। কেমন আছ তোমরা? কোন রহস্যের সমাধান করে এলে নাকি?'

সবার সঙ্গে হাত মেলালেন তিনি।

'না, স্যার,' জবাব দিল কিশোর 'কিছুই পাচ্ছি না। সে-জন্যেই তো আপনার কাছে আসা। মিস্টার ফগর্যাম্পারকটের ব্যস্ততা দেখে মনে হয় কোন

একটা রহস্য তিনি পেয়ে গেছেন। সেটা কি জানতে পারলে আমরাও সাহায্য করতে পারতাম।'

'হ্যাঁ, ফগর‍্যাম্পারকটকে একটা বিশেষ কাজ দেয়া হয়েছে। তোমরা খুব ভাল গোয়েন্দা, তাতে কোন সন্দেহ নেই আমার। তবে এই কেসটাতে তোমাদের না যাওয়াই ভাল।'

হতাশ হলো কিশোর। 'নিশ্চয় ওই চুরি-ডাকাতির ব্যাপারটা, তাই না, স্যার?'

'হ্যাঁ। চারগুলো সাংঘাতিক চালাক। কোন জিনিসটা কখন চুরি করতে হবে, ঠিক জানে। প্ল্যান করে কাজ করে ওরা। এ যাবৎ একজনকেও ধরতে পারিনি, চেনাও যায়নি কাউকে। তবে সন্দেহ করা হচ্ছে কয়েকজনকে। তারা চোর না-ও হতে পারে।'

হাঁ করে গিলছে যেন গোয়েন্দারা। মিটিমিটি হাসলেন ক্যাপ্টেন।

মরিয়া হয়ে উঠল কিশোর। তথ্য আদায়ের চেষ্টা করতে হবে ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে।

'মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট নিশ্চয় অনেক কিছু জানে, তাই না, স্যার? গ্রীনহিলসে কি কিছু ঘটছে?'

দ্বিধা করলেন ক্যাপ্টেন। 'তোমাদের বলেছি, এটাতে নাক গলানো উচিত হবে না। পুরোটা জানলে তোমরাও এ কথাই বলতে। গ্রীনহিলসে অবশ্য এখনও কিছু ঘটছে না, তবে সম্ভবত চোরদের কেউ মাঝে মাঝে যায় ওখানে–হয় মীটিং করার জন্যে, নয়তো কাউকে মেসেজ দেয়ার জন্যে–ঠিক জানি না।'

উজ্জ্বল হলো কিশোরের চোখ। 'স্যার, চোখ-কান তো অন্তত খোলা রাখতে পারি আমরা! আপনি যখন মানা করছেন সরাসরি নাক না হয় না-ই গলালাম। কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু ঘটলে দেখতে কিংবা শুনতে তো পারি? আপনি জানেন, কিছু কিছু ব্যাপারে বড়দের চেয়ে ছোটদের অনেক সুবিধা। বড়রা অনেক কথা ছোটদের সামনে বলে ফেলে, সন্দেহ করে না। অনেক কিছু করেও ফেলে।'

পেন্সিলের পেছনটা টেবিলে ঠুকতে লাগলেন ক্যাপ্টেন।

কিশোর বুঝল, দ্বিধায় পড়ে গেছেন তিনি। ওদেরকে কিছু করবার অনুমতি দেবেন কিনা ভাবছেন। উত্তেজনায় বুকের মধ্যে দুরুদুরু করতে লাগল তার। অনুমতি পেলেও কতটা কি করতে পারবে জানে না। এই কেসে ফগের সুবিধে ওদের চেয়ে অনেক বেশি। কারণ সে পুলিশের লোক, হয়তো অনেক তথ্য জানা; আর ওরা কিছুই জানে না। তাই বলে কাজটা হাতছাড়া করতেও রাজি নয় সে।

'বেশ,' অবশেষে বললেন ক্যাপ্টেন। পেন্সিলটা রেখে দিলেন টেবিলে 'অস্বাভাবিক কিছু ঘটে কিনা দেখতে পারো। তবে বোকামি করে কোন ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। সেটা করার অনুমতি আমি দেব না। শুধু চোখ খোলা রাখবে। সন্দেহজনক কিছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে আমাকে।'

হাসি ফুটল সবার মুখে কিশোর বলল, 'অনেক ধন্যবাদ, স্যার, আপনাকে কিছু না কিছু খুঁজে বার করবই আমরা মিস্টার ফগের মত সতর্ক থাকব।'

'এবার বোধহয় তার সঙ্গে পারবে না তোমরা,' মিটিমিটি হাসছে ক্যাপ্টেনের চোখ।

জবাব দিল না কিশোর। নীরবে হাসল কেবল। গ্রহণ করল চ্যা লঞ্জটা।

ক্যাপ্টেনের অফিস থেকে বেরিয়ে এল গোয়েন্দারা। গ্রীনহিলসে ফিরে চলল। হেডকোয়ার্টারে এসে আলোচনায় বসল।

'যাক, রহস্য একটা পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত,' কিশোর বলল। 'চোর ধরতে হবে।' সহকারীদের দিকে তাকাল। 'গত ক'দিনে সন্দেহজনক কাউকে দেখেছ গ্রীনহিলসে?'

সবাই ভাবতে লাগল। কিন্তু কেউ কিছু মনে করতে পারল না। সব স্বাভাবিক। কেবল প্রচণ্ড গরমে নদীর ধারে এসে তাঁবু ফেলছে বাইরের অনেক লোক। মেলা বসেছে। ওটা অস্বাভাবিক কোন ঘটনা নয়। গরম পড়লে প্রায় প্রতি বছরই নদীর ধারে এসে ভিড় জমায় শহুরে লোকজন।

'আমি কিছু মনে করতে পারছি না,' রবিন বলল। 'সাধারণ রহস্য নয় এটা। কোনখান থেকে শুরু করব, তা-ই বুঝতে পারছি না।'

'আগের রহস্যগুলোর মত করে চেষ্টা করতে পারি না?' প্রস্তাব দিল ফারিহা। 'প্রথমে সূত্র খুঁজব, তারপর যাদের সন্দেহ করি তাদের নাম লিখে একে একে তদন্ত চালাব।'

'কাদের সন্দেহ করি?' ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

তাই তো! কাদের সন্দেহ করে? চুপ হয়ে গেল ফারিহা।

'সূত্র নেই, কোথায় গিয়ে খুঁজব, জানি না; কী ভাবে কী করব!' প্রায় ককিয়ে উঠল রবিন। 'ফগ যা জানে সেটুকু জানলেও কাজ হত!'

'সন্দেহভাজনদের নাম হয়তো লেখা আছে তার কাছে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'ইদানীং যে সব চুরি হয়েছে, তারও তালিকা আছে নিশ্চয়। পুরানো পত্রিকা ঘাঁটলে আমরাও বের করতে পারব, তবে তাতে তেমন সুবিধে হবে বলে মনে হয় না। হলে এতদিনে সে-ই একটা কিছু করে ফেলত।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ থেকে মুসা বলল, 'তা হলে কাজটা কী আমাদের? কী করব?'

'এক কাজ করতে পারি,' কিশোর বলল, 'ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতে পারি। যেখানে বসে আরাম করে ভবঘুরে বুড়োরা, সেখানে গিয়ে বসতে পারি। বুড়ো জনসনকে তো গাঁয়ের মাঝখানে একটা বেঞ্চে প্রায়ই বসে থাকতে দেখা যায় আজ সকালে অবশ্য দেখিনি। হয়তো চলে গেছে। আর আসবে না। তা হলে তার

ছদ্মবেশে একই জায়গায় বসে নজর রাখা যাবে লোকের ওপর।'

খুব একটা খুশি হতে পারল না কেউ। এতে কতখানি কাজ হবে, আদৌ হবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে

ফারিহা বলল, 'কিন্তু যদি আবার চলে আসে বুড়োটা? লোকে অবাক হয়ে ভাববে, একই চেহারার দু'জন মানুষ এল কোত্থেকে?'

'তা বটে। ঝামেলার চোখেও পড়তে পারে ব্যাপারটা,' রবিন বলল।

একই বেঞ্চে একই চেহারার দু'জন বুড়ো বসে আছে, ফগ দেখলে কী রকম ভিরমি খাবে—কল্পনা করে হাসতে লাগল সবাই।

'আর কোন ছদ্মবেশ নিলে হয় না?' মুসা বলল, 'নজর রাখতে গিয়ে অন্যের নজরে পড়ে যাওয়ার কোন মানে হয় না।'

'এ সব করতে গেলে ঝুঁকি তো খানিকটা নিতেই হবে। বুড়োটাকে মানুষ চেনে,' যুক্তি দেখাল কিশোর। 'ও যে কানে শোনে না, জানে। সুতরাং একেবারে পাশে বসে গোপন কথা বলতেও ভয় পাবে না। তার ছদ্মবেশে বসে থাকলে অনেক কথা শুনতে পারব।'

'কিন্তু তুমি থাকতে থাকতেই যদি সে এসে হাজির হয়!'

'হলে তখন দেখা যাবে।'

দুই

বুড়ো সাজতে কিশোরকে সাহায্য করল সবাই। বাবার অনেক পুরানো একটা হ্যাট এনে দিল মুসা। রবিন তাদের গ্যারেজ থেকে নিয়ে এল মালীর ফেলে দেওয়া একটা ছেঁড়া কোট। একটা পুরানো শার্ট আর একটা মাফলারও জোগাড় হলো।

'একজোড়া জুতো দরকার,' কিশোর বলল। 'এমন ছেঁড়া, যাতে আঙুল সব বেরিয়ে থাকে। বুড়োর জুতোর মত।'

কাপড়-চোপড় সব পাওয়া গেলেও জুতো পাওয়াটাই সমস্যা হলো। তেমন ছেঁড়া জুতো কারও ঘরে নেই।

বুদ্ধি বাতলাল রবিন, 'লোকে ময়লা ফেলে আসে যে সব খাদে ওগুলোতে খুঁজে দেখা যায়। পাওয়া যেতে পারে।'

তাই তো! ময়লা ফেলবার ডিপো হলো আসল জায়গা। ছুটল সবাই। রবিনই খুঁজে বের করল ছেঁড়া একজোড়া জুতো।

পায়ে দিতেই দুই পায়ের প্রায় সবগুলো আঙুল বেরিয়ে গেল কিশোরের। খুব পছন্দ হলো তার, কেবল গন্ধটা বাদে। সাংঘাতিক ময়লা, আর দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে জুতোগুলো থেকে।

'চুলার ওপর দিয়ে শুকিয়ে আনতে হবে, তা হলে গন্ধ কিছুটা কমবে,' বলল সে।

আরও একটা জিনিস পাওয়া কঠিন হয়ে গেল, ট্রাউজার। বুড়ো ভবঘুরে যে জিনিস পরে, অত পুরানো আর সস্তা জিনিস গোয়েন্দাদের কারও বাড়িতেই নেই। মুসা পরামর্শ দিল গাঁয়ের পুরানো কাপড়ের দোকান থেকে কিনে কিছু জায়গায় ছিঁড়ে ময়লা লাগিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

'গ্রীনহিলসের দোকান থেকে কেনা উচিত হবে না,' কিশোর বলল। 'বলা যায় না, ফগের কানে চলে যেতে পারে সে-খবর। সন্দেহ হলেই পেছনে লাগবে আমাদের।'

'তা হলে মাঠ পেরিয়ে চলে যেতে পারি পাশের গাঁয়ে,' রবিন বলল। 'ওখান থেকে কিনতে পারি।'

সেটাই ঠিক হলো।

মাঠের উপর দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ এমন চিৎকার দিয়ে উঠল মুসা, সবাই ভাবল না জানি কী হয়ে গেল। কী হলো, কী হলো! হাত তুলে দেখাল সে। একটা কাকতাড়ুয়া পুতুল দাঁড়িয়ে আছে। ফসল তোলা হয়ে গেলেও ওটা নিয়ে যায়নি চাষী–হয় নিতে ভুলে গেছে, নয়তো বাতিল ভেবে ফেলে গেছে। পুতুলটার মাথায় হ্যাট–তার চাঁদি ফুটো, গায়ে কোট–পুরোটাই বলতে গেলে ছেঁড়া, আর এমন এক ট্রাউজার পরনে, যে জিনিস পয়সা দিয়ে মেলে না।

'এটাই তো চাই!' আনন্দে চিৎকার করে পুতুলটার দিকে ছুটে গেল কিশোর।

'খবরদার, না ধুয়ে পরো না,' সাবধান করল রবিন, 'কি না কি লেগে আছে! খুঁজলি-পাঁচড়া হয়ে মরবে শেষে!'

ট্রাউজার নিয়ে ফিরে এল ওরা। কিশোর নিজেই ধুয়ে নিল ওটা। ময়লা কিন্তু খুব একটা বেরোল না। বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে।

ছদ্মবেশের সমস্ত উপকরণ এনে জমা করা হলো ছাউনিতে, গোয়েন্দাদের হেডকোয়ার্টারে। সেগুলোর দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল ফারিহা। এত খারাপ জিনিস পরবে কী করে কিশোর!

'ভাল গোয়েন্দা হতে চাইলে অনেক কিছুই মেনে নিতে হয়। খুঁত খুঁত করলে চলে না,' নিরুত্তাপ স্বরে জবাব দিল কিশোর।

পরদিন সকালে মুসাদের ছাউনিতে কিশোরের ছদ্মবেশের মহড়া চলল। পুরানো কাপড়-চোপড়গুলো পরল সে। ছদ্মবেশ নেওয়ার নানা রকম জিনিস স্টকে আছে তার। সেখান থেকে একটা দাড়ি বের করে কেটেছেঁটে বুড়োর দাড়ির মত করে নিয়ে গালে লাগাল। নিজের ভুরু ঢেকে দিল নকল ভুরু দিয়ে। মাথায় পরল পরচুলা। মুখে রঙ করে নিয়ে চোখের কোণে ভাঁজ আঁকল সাবধানে।

'দারুণ হয়েছে, কিশোর, দারুণ!' হাততালি দিয়ে বলে উঠল ফারিহা।

'একেবারে বুড়োর মত লাগছে তোমাকে! না জানা থাকলে চিনতেই পারতাম না!'

কানের পেছনে হাত নিয়ে গিয়ে না শুনবার ভান করে খসখসে গলায় বলল কিশোর, 'কী বলছ?'

চোখ বড় বড় করে ফেলল ফারিহা। 'কিশোর, আসলেই তুমি কিশোর তো!'

হাসতে লাগল সবাই।

বারোটা নাগাদ মহড়া শেষ করে হাত থেকে ঘড়িটা খুলে পকেটে রেখে দিল কিশোর। বুড়োর ঘড়ি নেই। খসখসে গলায় বলল, 'এবার যাই। অনেক বেলা হলো, বসিগে। বিকেলের আগে বুড়ো আসবে না, সুতরাং দেখা হওয়ারও ভয় নেই।'

'আমরাও যাব,' মুসা বলল। 'না না, তোমার সঙ্গে বসব না। বেঞ্চের উল্টো দিকে ছোট যে দোকানটা আছে তাতে বসে লেমোনেড খাব। তুমি চোখ রাখবে মানুষের ওপর, আমরা রাখব তোমার ওপর।'

রবিনকে বাইরে পাঠাল কিশোর। আশেপাশে কেউ আছে কিনা দেখে আসবার জন্য। মুসার আম্মা কিংবা ওদের রাঁধুনি দেখে ফেললে হাঙ্গামা বাধাতে পারে।

কেউ নেই।

বেরিয়ে পড়ল গোয়েন্দারা। রাস্তায় কিশোর চলল আগে আগে, পেছনে অন্য তিনজন। টিটু চলেছে সঙ্গে। তাকে ধরে রেখেছে ফারিহা, যাতে গিয়ে কিশোরকে বিরক্ত করতে না পারে।

চাঁদিতে ফুটোওয়ালা হ্যাটটা প্রায় চোখের উপর নামিয়ে এনেছে কিশোর। কুঁজো হয়ে পা টেনে টেনে হাঁটছে।

'একেবারে বুড়োটার মত!' ফিসফিস করে বলল ফারিহা। 'অভিনয়টা সে করছে কী করে!'

'অনেক বড় অভিনেতা ও,' রবিন বলল।

বেঞ্চের কাছে এসে বসে পড়ল কিশোর। অনেকটা পথ হেঁটে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, 'আহ্' করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। রাস্তার দিকে তাকাল। রোদ ঝলমল করছে সবখানে।

লাঠির মাথায় হাত রেখে, হাতের উপর থুঁতনি ঠেকিয়ে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। বিশ্রাম নিচ্ছে যেন একজন সর্বহারা বুড়ো মানুষ। তার বন্ধুরা গিয়ে ঢুকল ছোট দোকানটায়। জানালার কাছে বসল তার উপর নজর রাখবার জন্য।

লেমোনেড শেষ হয়ে এসেছে ওদের, এই সময় সাইকেলে করে শিস দিতে দিতে এল একজন লোক। সাধারণ পোশাক পরা অতি সাধারণ চেহারার একজন মানুষ। কিন্তু বুড়োর উপর চোখ পড়তেই যেন চমকে গেল, ব্রেক কষল ঘ্যাঁচ করে। মনে হলো বুড়োকে দেখে অবাক হয়েছে।

সাইকেল থেকে নেমে ওটাকে ঠেলে নিয়ে এল বেঞ্চের পাশে। ঠেস দিয়ে

দাঁড় করিয়ে রেখে এসে বসল কিশোরের পাশে একটু দূরে

তাকিয়ে আছে লেমোনেড শপে বসা গোয়েন্দারা। ভয় পেয়েছে। তবে কি ফাঁস হয়ে গেছে কিশোরের ছদ্মবেশ? সন্দেহ করে বসেছে লোকটা?

সামান্য ঘাবড়ে গেছে কিশোরও। লোকটা এ ভাবে এসে বসল কেন?

নিচু স্বরে লোকটা বলল, 'এই সকাল বেলা এখানে এসে বসেছ কেন? আমি তো ভাবলাম বিকেলের আগে আসবে না। কিছু ঘটেছে? কারও আসার কথা আছে?'

বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল কিশোরের। তাকে বুড়োই ভেবেছে লোকটা। এই সকাল বেলা দেখে অবাক হয়েছে। কিন্তু প্রশ্নগুলোর মানে কী?

হঠাৎ মনে পড়ল কিশোরের, বুড়োটা কালা, কানে শোনে না। এক কানের পেছনে হাত নিয়ে গিয়ে আরেক কান বাড়িয়ে দিল লোকটার দিকে। সরাসরি চোখের দিকে তাকাল না, ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে। প্রচুর কফ হয়েছে যেন গলায় এমন ভঙ্গিতে ঘড়ঘড়ে স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কী বলছ?'

অস্থির ভঙ্গিতে হাত নাড়ল লোকটা। বিড়বিড় করে বলল, 'ব্যাটা ধ্যান্দা! কানেও শোনে না!' চট করে দেখে নিল কাছাকাছি কেউ আছে কিনা।

ধীর গতিতে সাইকেল চালিয়ে এল আরও একজন লোক। কিশোরের কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে থেমে সিগারেট বের করল ধরানোর জন্য।

এই দ্বিতীয় লোকটি আর কেউ নয়, কিশোর গোয়েন্দাদের মহাশত্রু স্বয়ং কনস্টেবল ফগর‍্যাম্পারকট ওরফে ঝামেলা। মোটা শরীর। দরদর করে ঘামছে।

কৌতূহলী চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে লেমোনেড শপে বসা গোয়েন্দারা।

এতক্ষণ চুপচাপ থাকলেও ফগকে দেখে আর চুপ থাকতে পারল না টিটু। ঘেউ ঘেউ করে একছুটে বেরিয়ে গেল। ফগের পা কামড়ানোর সুযোগ পেয়েছে। পেছনে ছুটল গোয়েন্দারা। ফগকে যত খুশি কামড়াক, তাতে ওদের আপত্তি নেই; ভয়টা হলো কিশোরের কাছে না চলে যায়।

কিন্তু কিশোরের চেয়ে এই মুহূর্তে ফগকে অনেক বেশি আকর্ষণীয় মনে হলো কুকুরটার কাছে। তার পায়ের চারপাশে ঘুরে ঘুরে কামড় বসানোর সুযোগ খুঁজতে থাকল। ফগও লাথি মারবার চেষ্টা করতে লাগল। প্রচণ্ড খারাপ হয়ে যাচ্ছে মেজাজ।

তাড়াতাড়ি উঠে ফগের অলক্ষে সামনের মোড়টার দিকে এগোল কিশোর। ঝামেলা পুরোপুরি খেপে যাওয়ার আগেই সরে পড়তে চাইছে। আড়চোখে সেটা দেখতে পেল মুসা। সুতরাং টিটুকে সামলানোর চেষ্টা করল না। তার ইচ্ছে ফগকে ব্যস্ত রাখুক কুকুরটা, সরে পড়বার সময় পাক কিশোর।

অনেক কষ্ট করে যেন অবশেষে টিটুকে সামলাতে পারল তিনজনে।

প্রথমেই বেঞ্চের দিকে তাকাল ফগ।

শূন্য বেঞ্চ! বুড়োটাও নেই, অন্য লোকটাও না

ভীষণ রাগে চিৎকার করে উঠল সে। 'ঝামেলা! হতচ্ছাড়া কুত্তা! এবার তোকে গারদে না ভরেছি তো আমার নাম ফগর‍্যাম্পারকট নয়! ব্যাটাদের কয়েকটা প্রশ্ন করতাম, এই হারামী কুত্তাটার জন্যে পারলাম না! গেল কোথায় ওরা!'

'চলে গেছে!' হাসি চেপে শান্তকণ্ঠে জবাব দিল রবিন।

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি!' খেঁকিয়ে উঠল ফগ। 'এই কুত্তাটাকে হাজতে ভরতে পারলে...'

'কুকুরের হাজত নেই, তাই না, মিস্টার ফগ?' নিরীহ স্বরে জানতে চাইল ফারিহা।

'চুপ, ফাজিল মেয়ে কোথাকার!' আরও জোরে চিৎকার করে উঠল ফগ। 'কতবার বলেছি, আমি ফগ নই, ফগর‍্যাম্পারকট, মনে থাকে না! যত্তসব ঝামেলা এসে জুটেছে এই গাঁয়ে! আমার সবচেয়ে দামী সূত্রটাকেও তাড়াল!' হঠাৎই খেয়াল করল কিশোর নেই ওদের মধ্যে। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'ঝামেলা! তোমাদের বন্ধু সেই মোটকা ছেলেটা কই! আবার কোন গোল পাকাচ্ছে না তো?'

'সে এখানে নেই,' জবাব দিল মুসা। 'বেশি দরকার? তা হলে বাড়ি থেকে ডেকে এনে দিতে পারি।'

'থামো, আর পাকামো করতে হবে না! যাও, ভাগো এখান থেকে!' মুসাকে ধমক দিয়ে, সবার দিকে, বিশেষ করে টিটুর দিকে আরেকবার জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সাইকেলে চাপল ফগ। প্যাডেল ঘোরাতে গিয়েও কী ভেবে থেমে গেল। রবিনের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'কোত্থেকে উদয় হলে তোমরা?'

'উদয় হলাম মানে?'

'মানে কোত্থেকে বেরোলে? রাস্তায় তো ছিলে না!'

'লেমোনেড খাচ্ছিলাম,' দোকানটা দেখাল রবিন।

'বুড়োটাকে দেখেছ? বেঞ্চে বসে ছিল।'

'দেখেছি। ছায়ায় বসে বসে ঝিমুচ্ছিল। খুব গরম তো...'

'আরও একটা লোক বসে ছিল তার পাশে। কথা বলছিল নাকি?'

'তা কী করে বলব? অত দূর থেকে কিছু শোনা যায় না।' বিস্মিত হলো রবিন। ফগ এ-সব প্রশ্ন করছে কেন?

'আমার সঙ্গে যেতে হবে তোমাদের,' আচমকা বলে বসল ফগ। 'বুড়োটার সঙ্গে আমি দেখা করব। সে-সময় তোমাদের থাকতে হবে সামনে।'

ভয় পেয়ে গেল তিন গোয়েন্দা। কী করতে চায় ফগ? আসল বুড়োর সঙ্গে কথা বলে বুঝতে চায় বেঞ্চের বুড়োটা নকল ছিল কিনা? কোন রকম সন্দেহ হয়েছে তার?

তিন

'অত সময় নেই আমাদের…' ঘুরে দাঁড়াতে গেল রবিন।

'যেতেই হবে!' গর্জে উঠল ফগ। 'এটা আমার অর্ডার। তোমাদের স্বাক্ষ্য দরকার হতে পারে।'

সুতরাং যেতেই হলো ওদের। টিটুকে সামলাতে কষ্ট হলো ফারিহার। কেবলই ছুটে গিয়ে ফগের পায়ে কামড়ানোর চেষ্টা করছে। রাস্তার কয়েকটা মোড় ঘুরে গলির মাথার নোংরা জীর্ণ দুটো কুটির চোখে পড়ল। প্রথমটার দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ল ফগ।

সাড়া নেই।

আবার কড়া নাড়ল সে। থাবা দিল।

অস্বস্তি বোধ করছে গোয়েন্দারা। ফগের হাতে এ ভাবে ধরা দেওয়াটা উচিত হয়নি, ভাবছে সবাই।

এবারও জবাব এল না।

শেষে জোরে ঠেলা দিয়ে পাল্লা খুলে ফেলল ফগ। ঘরটা দেখা গেল। যেমন নোংরা তেমনি আগোছাল। ভয়াবহ দুর্গন্ধ এসে ঝাপটা দিল নাকে।

এক কোণে একটা ছোট বিছানা। তাতে ঘুমিয়ে আছে একজন বৃদ্ধ মানুষ। গলা পর্যন্ত ময়লা চাদরে ঢাকা। ধূসর চুলে ঢাকা মাথাটা শুধু বেরিয়ে আছে। পাশের চেয়ারে রাখা পুরানো কোট, সুতির প্যান্ট, শার্ট, মাফলার, হ্যাট। জুতো রাখা চেয়ারের পায়ার কাছে।

গটমট করে এগিয়ে গেল ফগ। ধমক দিয়ে বলল, 'ঝামেলা! ঘুমানোর ভান করে কোন লাভ হবে না। ওঠো।'

লাফ দিয়ে উঠে বসল বুড়ো। ঘরের মধ্যে ফগকে দেখে খুব অবাক হলো। বড় বড় হয়ে গেল চোখ। খসখসে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী বলছেন?'

'বলছি ঘুমানোর ভান করে লাভ নেই!' গর্জে উঠল ফগ। 'কয়েক মিনিট আগে গাঁয়ের ভেতর বেঞ্চে বসে ছিলে। আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

'আজ ঘর থেকেই বেরোইনি!' কোলা ব্যাঙের স্বর বেরোল বুড়োর গলা থেকে। 'ভেবেছিলাম দুপুর পর্যন্ত ঘুমাব। ছায়া পড়লে খেয়েদেয়ে একবারে বেরোব।'

'ঝামেলা!' চিৎকার করে উঠল ফগ। 'মিথ্যে কথা! এই খানিক আগে বেঞ্চে বসে ছিলে। একটা লোক এসে তোমার পাশে বসল। সেই লোকটা কে? ভাল চাও

তো জলদি বলো!'

বুড়োর জন্য দুঃখ হলো ফারিহার। অহেতুক ধমক খাচ্ছে।

আরও, আরও বেশি অবাক হলো জনসন। 'কী বলছেন?'

'আমি একা নই,' গোয়েন্দাদের দেখাল ফগ, 'এই ছেলেমেয়েগুলোও দেখেছে। সবার চোখের ভুল হতে পারে না। এই, বলো তোমরা, দেখেছ যে বলো।'

'ইয়ে,' দ্বিধা করতে লাগল রবিন। 'ইয়ে...' কী বলবে বুঝতে পারছে না। সে ভাল করেই জানে বেঞ্চে বুড়ো বসেনি। ওদিকে কিশোরের কথা ফাঁস করে দেয়াটাও ঠিক হবে না।

বুদ্ধি খেলে গেল মুসার মাথায়। বলল, 'মিস্টার ফগ...'

'ধ্যাত্তোর, ঝামেলা! ফগর‍্যাম্পারকট!' শুধরে দিল পুলিশম্যান।

'সরি, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট, বুড়ো হলে মানুষের চেহারা অন্য রকম হয়ে যায় বোধহয়। কোট-প্যান্ট পরা থাকলে এক রকম দেখায়, না থাকলে আরেক রকম। চিনতেই অসুবিধে হয়।'

'বেশ, তা হলে কাপড় পরিয়েই দেখব।' চেয়ারে রাখা কাপড়গুলো দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল ফগ, 'এগুলো পরে ছিল ও, তাই না?'

মাথা নাড়ল মুসা, 'সরি। সেটা বলতে পারব না। খেয়াল করিনি।'

কেটে পড়বার সময় হয়েছে, ভাবতে লাগল রবিন। কারণ ফগের লাল মুখ আরও লাল হয়ে যাচ্ছে। বলল, 'আমরা যাই। বাড়ি যেতে দেরি করলে মা বকবে।'

ফগকে আর বাধা দেওয়ার সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে। তার সঙ্গে বেরিয়ে এল মুসা আর ফারিহা।

কিশোরকে খুঁজতে লাগল ওরা। ওকে পাওয়া গেল মুসাদের বাগানের কোণে। ছদ্মবেশ খুলে ফেলেছে। পুরানো কাপড়গুলো লুকিয়ে রেখেছে ছাউনিতে। বন্ধুদের দেখেই বলে উঠল, 'অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না? আরে ওই লোকটার কথা বলছি। আমার পাশে এসে বসল। কথা বলল। ভুলেই গিয়েছিলাম বুড়ো কানে খাটো। আরেকটু হলেই জবাব দিয়ে বোকামি করে ফেলেছিলাম।'

'কী বলেছে?' জানতে চাইল মুসা।

কী বলেছে, জানাল কিশোর। তারপর বলল, 'ঝামেলাটা এসেই সর্বনাশ করে দিল। নইলে হয়তো আরও কথা বলত।'

'সূত্র পাওয়া যেত?' ফারিহার প্রশ্ন।

'হয়তো যেত,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'ক্যাপ্টেন যে বলেছেন, মনে নেই-চোরেরা গ্রীনহিলসে কোথাও মীটিঙ করে, কিংবা এখানে থেকেই একজন আরেকজনের কাছে খবর পাঠায়, যোগাযোগ করে?'

মুসা বলল, 'বুড়ো জনসন চোরের সর্দার না তো?'

'মনে হয় না। এই বয়েসে সর্দার হবার যোগ্যতা তার নেই বড়জোর খবর চালাচালির মাধ্যম হতে পারে।'

'কিন্তু সে তো কানেই শোনে না,' রবিন বলল।

'তাতে কী? মেসেজ পাচার করতে কানে শোনার দরকার হয় না। কাগজে লিখেও দেয়া যায়। একটা কিছু পাওয়া গেল মনে হচ্ছে।'

ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল ওরা। সূত্র পাওয়া গেছে ভেবে সবচেয়ে বেশি উত্তেজিত হলো ফারিহা।

কিশোর বলল, 'এমনও হতে পারে, এই গ্রীনহিলসের কোনখানেই হেডকোয়ার্টার বানিয়েছে চোরেরা। ধরা পড়ার ভয়ে কেউ কারও সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে না। করে বুড়োর মাধ্যমে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নিয়মিত গিয়ে বেঞ্চে বসলে ওদের কারও না কারও সঙ্গে দেখা হয়েই যাবে আমার। মেসেজ দেবে আমার হাতে...'

'তখন তুমি জেনে যাবে লোকটা কে!' চিৎকার করে উঠল ফারিহা। 'ক্যাপ্টেনকে গিয়ে জানাতে পারব আমরা সে-খবর! চোরগুলোকে ধরতে পারবে পুলিশ!'

'অনেকটা ওরকমই কিছু ঘটবে। বুড়ো বসে বিকেলের দিকে। মেসেজ দিতে এলে চোরেরাও আসবে ওই সময়। কিন্তু বুড়ো বসে থাকলে আমি গিয়ে কী করে বসব বুঝতে পারছি না।'

'তার যাওয়া ঠেকাতে হবে, এ ছাড়া আর কী!' রবিন বলল।

'কিন্তু কী ভাবে?'

জবাব দিতে পারল না কেউ।

সেটা নিয়ে পরে ভাবা যাবে ভেবে অন্য প্রসঙ্গে এল কিশোর, 'আজ সকালে যে লোকটা এল, তাকে ভাল করে দেখেছ তোমরা? আমি দেখতে পারিনি। চোখের দিকে তাকালে আমাকে চিনে ফেলতে পারে এই ভয়ে ভাল করে তাকাতেই পারিনি।'

'দেখার তেমন কিছু ছিল না,' রবিন বলল। 'অতি সাধারণ চেহারা, সাধারণ পোশাক...দাঁড়াও দাঁড়াও, একটা ব্যাপার একটু অন্য রকম ছিল! সাইকেলে বেলের বদলে হর্ন লাগানো ছিল! ব্যাটারিতে বাজে যে, ওগুলো।'

'ঠিক!' তুড়ি বাজাল মুসা। 'আমারও মনে আছে।'

'হর্ন, না?' নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'এটাকে সূত্র হিসেবে ধরা যেতে পারে–সাইকেলে বেলের বদলে হর্ন। আর কিছু?'

অস্বাভাবিক আর কিছুর কথা মনে করতে পারল না কেউ।

আবার আগের কথায় ফিরে এল কিশোর, 'বিকেলে বুড়োটার বেঞ্চে বসা

ঠেকাব কী করে?'

এবারও জবাব নেই কারও।

'এক কাজ করতে পারি!' উপায় বের করতে পেরে জ্বলজ্বল করে উঠল কিশোরের চোখ। 'খবর বাহক সেজে গিয়ে বুড়োর পাশে বসে বলতে পারি, দু'তিন দিন তার ওখানে বসা ঠিক হবে না। পুলিশের ভয় দেখাতে পারি।'

'ঠিক! ঠিক!' রবিন বলল। 'ফগের কথা বলতে পারো। বলবে, তার ওপর নজর রাখতে শুরু করেছে সে।'

'এবং কথাটা মিথ্যে নয়। সেটা অবশ্য আমাদের জন্যে খারাপ হলো। ঝামেলাও জেনে গেছে কার ওপর নজর রাখতে হবে। বুড়োর ওপর সন্দেহ জেগেছে তার। সুতরাং ওখানে যাবেই সে। সারাক্ষণ তার কড়া নজরের সামনে বসে থাকতে হবে আমাকে। পুলিশ দেখলে চোরেরাও আসবে না আমার কাছে খবর জানাতে।'

'সন্দেহজনক কাউকে আসতে দেখলে কায়দা করে কিছুক্ষণের জন্যে ফগকে সরিয়ে নিতে পারি আমরা,' মুসা বলল। 'মনে হয় কঠিন হবে না কাজটা। সাইকেলে যে বেল নেই, সেটা নিশ্চয় সে-ও খেয়াল করেছে। রাস্তার মোড়ের আড়ালে থেকে সাইকেলের হর্ন বাজাব আমরা। সে ভাববে, আসল লোককে পেয়ে গেছে। আড়ালে থেকে বুড়োকে ডাকছে কেউ। ব্যস, দেখার জন্যে ছুটে যাবে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হ্যাঁ, এতে কাজ হবে বলে মনে হয়। তবে হর্নের ব্যাপারটা যদি সে লক্ষ করে থাকে।'

'করে না থাকলেই বা কী?' রবিন বলল, 'আমরা তাকে জানাব। চলো না, এখুনি গিয়ে বলে দিই তাকে। বলব, জরুরী সূত্র মনে হয়েছে এটা আমাদের কাছে।'

'বুদ্ধিটা মন্দ নয়। চলো।' উঠে দাঁড়াল কিশোর।

ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে আঁতকে উঠল মুসা, 'সর্বনাশ! এত বেলা! এখন বেরোলে লাঞ্চের দেরি হবে, আস্ত রাখবে না মা। তার চেয়ে খেয়েদেয়ে বিকেল বেলা যাই, কি বলো?'

'ঠিক আছে, তোমাদের অসুবিধে থাকলে আমি একলাই যেতে পারব ফগের কাছে। বিকেলে দেখা করব তোমাদের সঙ্গে।'

ভরপেট খেয়ে একটু গড়িয়ে নেবার জন্য সবে শুয়েছিল ফগ, কিশোরকে দেখে চমকে গেল। আরও অবাক হলো যখন শুনল লোকটার সাইকেলে বেলের বদলে হর্ন ছিল। ব্যাপারটা সে লক্ষ করেনি অথচ ছেলেমেয়েগুলো ঠিকই করেছে ভেবে মনে মনে গালমন্দ করল নিজেকে।

মোলায়েম স্বরে কিশোর বলল, 'ভাবছি এখন থেকে কোন সূত্র পেলেই এসে আপনাকে জানাব, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট। হর্নটা তো একটা সূত্র, তাই না?'

'ঝামেলা! সূত্র? কিসের সূত্র? আবার নাক গলাতে শুরু করোনি তো?'

'নাক গলাব কিসে, বলুন?' নিরীহ ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'কিছু ঘটছে নাকি? হর্নওয়ালা লোকটাকে মনে হচ্ছে আপনার দরকার?'

সন্দেহ দেখা দিল ফগের চোখে। 'ওসব নিয়ে তোমার মাথা না ঘামালেও চলবে। একটা কথা বলো তো এখন বাপ, অন্য ছেলেগুলোর সঙ্গে ছিলে না তুমি; সাইকেলওয়ালা লোকটা যখন এল, তোমাকে দেখা যায়নি ওখানে; তাহলে হর্নের কথাটা জানলে কী করে?'

মনে মনে ঘাবড়ে গেলেও সেটা প্রকাশ করল না কিশোর। মুখের ভাব স্বাভাবিক রেখে ফগের প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'তারমানে আপনি চাইছেন না সূত্র পেলে আপনাকে এনে দিই?'

'না না, তা বলছি না,' তাড়াতাড়ি বলল ফগ, সূত্র হারাতে চায় না সে। 'তবে...'

'ঠিক আছে, আমি এখন যাই,' বেকায়দা প্রশ্ন করে বসতে পারে ফগ, এই ভয়ে আর একটা মুহূর্ত সেখানে দাঁড়াল না কিশোর। বেরিয়ে চলে এল ফগের বাড়ি থেকে।

কিছুদূর গিয়ে একটা দোকানে ঢুকে একটা সাইকেলের হর্ন কিনল সে। এটা দিয়েই ফগকে ধোঁকা দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। আবার চলে এল ফগের বাড়ির কাছে। জানালার নীচে লুকিয়ে থেকে হর্ন বাজাল।

আবার চোখ লেগে এসেছিল ফগের। হর্ন শুনে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে ছুটে এল জানালার কাছে। কিন্তু কোন সাইকেল দেখতে পেল না। দেখতে পেল একটা ছেলে দৌড়ে যাচ্ছে। কিশোর পাশাকে চিনতে অসুবিধে হলো না তার। অবাক হয়ে ভাবতে লাগল—সাইকেল নেই, তাহলে হর্ন বাজল কোথায়!

চার

পরদিন দুপুরে বেঞ্চে বসার জন্য তৈরি হতে শুরু করল কিশোর। বুড়ো জনসনের পোশাক পরল না। পরল এক বুড়ির পোশাক, বেলুন বিক্রি করে বুড়ি।

'বুড়ো কি চিনতে পারবে আমাকে?' বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আমরাই পারছি না,' বলল রবিন, 'সে পারবে কী করে!'

'তোমার কাছ থেকে গিয়ে একটা বেলুন কিনব আমি,' কিশোরের দেওয়া কতগুলো বেলুন ফোলাতে ফোলাতে বলল ফারিহা। 'আমরাও যে তোমাকে চিনি

না, বুঝিয়ে দেব।'

'তা হলে তো আরও ভাল হয়,' খুশি হয়ে বলল কিশোর। 'আড়ালে থেকে চোখ রাখলে ফগও দ্বিধায় পড়ে যাবে। কিশোর পাশা বলে সন্দেহই করবে না আমাকে। ভাববে সত্যিই আমি বুড়ি, বেলুন বিক্রি করে খাই।'

'একজন মহিলাকে চোরের সাগরেদ বলেও ভাবতে পারবে না,' বলল রবিন

'তা হলে এবার যাওয়া যায়, কি বলো? ফারিহা, বেলুনগুলো ফোলানো হয়েছে সব?'

'হ্যাঁ, হয়েছে,' সুতোয় বাঁধা অনেকগুলো বেলুন কিশোরের হাতে ধরিয়ে দিল ফারিহা।

ঠিক এই সময় ছাউনির দরজায় উঁকি দিলেন মুসার আম্মা। তিনি যে আসছেন শুনতেই পায়নি কেউ এমনকি টিটুও টুঁ শব্দ করেনি। করবার কোন কারণ নেই। মিসেস আমান তার পরিচিত।

বেলুন-বেচা বুড়িকে দেখে ভুরু কুঁচকে গেল মিসেস আমানের। 'আপনি এখানে কী করছেন?'

থমকে গেছে সবাই। আমতা আমতা করে মুসা জিজ্ঞেস করল, 'কেন, ওকে চেনো নাকি, মা?'

'চিনব কোত্থেকে? এই তো প্রথম দেখলাম। উনি এখানে ঢুকেছেন কেন?'

'আমরা ডেকে এনেছি। বেলুন কেনার জন্যে।'

'এখানে আনার কি দরকার ছিল, রাস্তা থেকেই কিনতে পারতি। যাকে তাকে বাড়িতে ঢোকানো আমি পছন্দ করি না, জানিস।' বুড়ির পায়ের কাছে বসে থাকা টিটুর ওপর চোখ পড়তেই কিশোরের কথা মনে পড়ল মিসেস আমানের। সে নেই এই দলের মধ্যে। 'কিশোর কোথায়?'

'আছে,' অন্য দিকে তাকিয়ে জবাব দিল মুসা। 'ডেকে আনব?'

'না, দরকার নেই। ওর জন্যেই নিশ্চয় অপেক্ষা করছিস তোরা? ও পছন্দ করে দেবে, এই তো? তাড়াতাড়ি কিনে নিয়ে বিদায় দে মহিলাকে। আর যেন কখনও না ঢোকে।'

'না, আর ঢুকবে না।'

তাড়াতাড়ি ছদ্মবেশী কিশোরকে নিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। রাস্তায় মায়ের দৃষ্টিসীমার বাইরে এসে হাঁপ ছাড়ল। কপালের ঘাম মুছে কাঁপা গলায় মুসা বলল, 'উফ আরেকটু হলেই মরেছিলাম! মা-টার যন্ত্রণায় আর বাঁচি না! সব কিছুতে খবরদারি! বুড়িটা যে আসলে বুড়ি নয়, কিশোর, বুঝে ফেললে কী অবস্থাটা হত!'

'কী আর হত,' খালার ব্যাপারে মুসার চেয়ে অনেক সাহসী ফারিহা। 'ধরা পড়লে বলে দিতাম, ছদ্মবেশ ছদ্মবেশ খেলছি আমরা।'

'ছদ্মবেশ নেয়া মোটেও পছন্দ না, মা'র, জানিস না? তার ধারণা, ছদ্মবেশ

নিয়ে খারাপ কাজ করা সহজ।'

গাঁয়ের ভেতর এসে দেখা গেল বেঞ্চে বসে আছে বুড়ো। লাঠিতে ভর দিয়ে ঝিমুচ্ছে।

'আমি যাচ্ছি,' কিশোর বলল। 'তোমরা লেমোনেড শপে যাও, লক্ষ রাখো।'

বেঞ্চে এসে বসল সে। হাতে বেলুনের সুতোর মাথাগুলো পেঁচিয়ে নিয়েছে, যাতে ছুটে যেতে না পারে। তার আগমন খেয়ালই করল না যেন বুড়ো। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে তাকাচ্ছে লোকে। বাচ্চা নিয়ে যাচ্ছে একজন মহিলা। একটা বেলুন কেনবার জন্য থামল। বুড়ো মানুষের মত নুয়ে বাচ্চাটার গাল টিপে আদর করে দিল কিশোর।

'ও এত কিছু মনে রাখে কী করে!' লেমোনেড শপের দিকে এগোতে এগোতে বলল রবিন। 'আমার মাথায়ই আসত না বুড়ো মহিলারা অমন করে!'

'আমারও না,' স্বীকার করল মুসা। 'ছদ্মবেশকে আরও নিখুঁত করে তোলে এ সব ছোটখাট কাজ।'

দোকানে ঢুকল ওরা। একটা টেবিলে বসে কাগজ পড়ছে একজন লোক। পেটের কাছটায় অতিরিক্ত মোটা। দেখেই মুসার গায়ে কনুই দিয়ে গুঁতো মারল রবিন। মুসাও দেখে গুঁতোটা ফিরিয়ে দিল রবিনকে।

চিনতে পেরেছে দু'জনেই। সাদা পোশাকে বসে খবরের কাগজ পড়বার ভান করছে ফগ। নজর রাস্তার ওপাশের বেঞ্চের দিকে।

'গুড মর্নিং, মিস্টার ফগ,' কোমল স্বরে বলতে গেল মুসা। 'আজ আপনার ছুটি?'

'ঝামেলা!' মেজাজ খিঁচড়ে গেল ফগের। এই ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে আর পারা যায় না! সবখানেই হাজির! শুধরে দিল মুসাকে, 'ফগর্‌্যাম্পারকট!'

'সরি, ফগর্‌্যাম্পারকট। লেমোনেড খেতে এসেছেন? আমাদের সঙ্গে খান একটা।'

ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল ফগ। খবরের কাগজ পড়ায় মন দিল। সাদা পোশাকে তাকে অন্য রকম লাগছে। কেমন আজব চেহারাই মনে হলো গোয়েন্দাদের কাছে। ইউনিফর্মে বরং ভাল লাগে। ফারিহার তো সন্দেহই হতে লাগল, এই লোক ফগর্‌্যাম্পারকট কিনা।

জানালার ধারে বসে লেমোনেড খেতে লাগল ওরা। নিজেরটা শেষ করে ফারিহা বলল, 'বেলুনগুলো খুব সুন্দর। আমি একটা কিনিগে।'

'মোটকা ছেলেটা কোথায়?' আচমকা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল ফগ।

'মোটকা? কোন মোটকা?' অবাক হলো যেন রবিন।

নাক টানল ফগ। 'ঝামেলা! আরে তোমাদের ওই বন্ধুটা, কিশোর পাশা না কী যেন নাম কী বলছি ভালই বুঝতে পারছ। অত ভণিতা করো কেন?'

'ওহ্, কিশোর। আছে এখানেই। ডাকব? দেখতে চান?'

'না না, দরকার নেই,' বলল বটে, কিন্তু ফগের চোখ ঘুরে বেড়াতে লাগল চারপাশে, 'এখানে' কোথায় আছে কিশোর, খুঁজছে। 'ওর তো চুপচাপ থাকার কথা নয়। কিছু একটা করছে নিশ্চয়?'

'তাই নাকি?' অবাক হওয়ার ভান করল আবার রবিন। 'কই, আমাদের কিছু বলেনি তো!'

মুচকি হেসে বেরিয়ে এল ফারিহা। কিশোরের কাছে এসে বলল, 'একটা বেলুন দেবেন, প্লীজ?' ফিসফিস করে বলল, 'লেমোনেড শপে সাদা পোশাকে বসে আছে ফগ। নজর রাখছে এদিকে। সে বেরিয়ে না গেলে বুড়োকে তোমার মেসেজ দিয়ো না।'

'নাও,' ফারিহার হাতে একটা বেলুন ধরিয়ে দিল কিশোর। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'খুব ভাল জিনিস। ফুটো না করলে সহজে কিছু হবে না।'

বেলুনের দাম দিয়ে লেমোনেড শপে ফিরে এল ফারিহা।

আরও লেমোনেডের অর্ডার দিল মুসা।

দোকানের পেছন দিকে টেলিফোন বাজল। লেমোনেড শপের মালিক এক মহিলা, ডেকে বলল, 'মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট, আপনার ফোন।'

'ঝামেলা!' বলে ফোন ধরবার জন্য উঠে গেল ফগ। পেছনের অন্ধকার কোণটায় গিয়ে ঢুকল। ওখান থেকে বেঞ্চে বসা কিশোরকে দেখতে পাবে না সে।

ব্যাপারটা লক্ষ করল রবিন। বুড়োকে মেসেজ দেওয়ার এটাই সুযোগ কিশোরের। 'উফ্, সাংঘাতিক গরম!' বলে আচমকা উঠে দাঁড়াল সে। 'একটু ঠাণ্ডা হয়ে আসি। তোমরা লেমোনেড শেষ করে আসো।'

দোকান থেকে বেরিয়েই দ্রুত পা চালাল রবিন। চলে এল বেঞ্চের কাছে। বেলুন দেখার ছুতোয় কিশোরের প্রায় গায়ের ওপর ঝুঁকে ফিসফিস করে বলল, 'ঝামেলা ফোনে কথা বলছে। ওখান থেকে তোমাকে দেখতে পাবে না। যা করার করে ফেলো তাড়াতাড়ি।'

বেলুন পছন্দ হয়নি, এমন ভঙ্গি করে চলে এল রবিন।

বুড়োর কাছে সরে গেল কিশোর। কনুই দিয়ে গুঁতো দিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে তাকাল বুড়ো। পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করে তার হাতে গুঁজে দিয়ে আবার আগের জায়গায় সরে এল কিশোর।

কাগজটা পকেটে রেখে দিল বুড়ো। আরও কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে থাকবার পর নাক দিয়ে বিচিত্র একটা শব্দ করে উঠে দাঁড়াল। পা টেনে টেনে এগোল মোড়ের দিকে।

কিশোরের কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে তাকে অনুসরণ করল রবিন।

মোড়ের অন্য পাশে এসে পকেট থেকে কাগজটা বের করে পড়ল বুড়ো।

দেশলাই বের করে আগুন ধরিয়ে ছুঁড়ে ফেলল পথের পাশে। বেঞ্চে আর ফিরে গেল না। সোজা এগোল বাড়ির দিকে।

আবার বেঞ্চের কাছে ফিরে এল রবিন বেলুন পছন্দ করতে লাগল। ভঙ্গিটা এমন যেন আর কোথাও বেলুন নেই, পছন্দ না হলেও এখান থেকেই কিনতে হবে।

'মেসেজটা পড়েছে?' জানতে চাইল কিশোর।

'পড়েছে। বাড়ি চলে গেছে। কী লিখেছিলে?'

'ওই তো, যা কথা ছিল—পুলিশ নজর রাখছে, কয়েক দিন যেন বিকেল বেলা না আসে। ও নিশ্চয় বিশ্বাস করেছে। চোরদের সঙ্গে এখন অন্য কোন ভাবে যোগাযোগ না করলেই হয়।'

'করতে পারবে বলে মনে হয় না। তাহলে এখানে বসত না।' রাস্তা দিয়ে একজন লোক যেতে দেখে জোরে জোরে বলল রবিন, 'দেখি, ওই বেলুনটা দিন। কত?'

বেলুন নিয়ে দোকানে ফিরে এল সে।

ফগের কথা তখনও শেষ হয়নি। ভাল। কিছুই দেখতে পায়নি সে। মুসা আর ফারিহার লেমোনেড খাওয়া হয়ে গেছে। ওদেরকে নিয়ে বেরিয়ে এল রবিন। ফোন সেরে ফিরে এসে বেঞ্চে বুড়োকে দেখতে না পেলে কী রাগা রাগবে ফগ ভেবে হাসি পেল।

বেরিয়ে দেখে বেলুন-বেচা বুড়িও চলে গেছে। কোথায় যাবে, জানা আছে ওদের। মুসাদের ছাউনিতে।

পাঁচ

একটা জরুরি কাজ শেষ হলো। পরের কয় দিন কি কি করবে সেই আলোচনায় বসল ওরা।

কিশোর বলল, 'ফগ নজর রাখবেই। যা করার তার নাকের নীচ দিয়ে করতে হবে।'

'কী করব?' মুসার প্রশ্ন। 'তুমি তো গিয়ে বুড়ো সেজে বসে থাকবে বেঞ্চে মেসেজের অপেক্ষায়। কিন্তু আমরা? কিছু একটা আমাদেরও করতে হবে, নইলে বিরক্ত লাগবে।'

'হউ!' করে তাকে সমর্থন করল টিটু।

'সে-ও কাজ চায়,' হেসে ফেলল ফারিহা। 'তুই আবার কী করবি, টিটু?'

কিশোরকে বলল, 'আসলে তোমাকে ঘন ঘন ছদ্মবেশ নিতে দেখে অবাক হয়ে গেছে বেচারা। বুঝতে পারছে না এ ভাবে ভোল পাল্টাচ্ছ কেন তুমি।'

'কী কী জানলাম আমরা, সেটা নিয়ে আগে আলোচনা করা যাক,' কিশোর বলল। 'তারপর ভাবব কে কী করব। কিছু না কিছু আমাদের সবাইকেই করতে হবে। নইলে পাঁচ গোয়েন্দা বলার কোন অর্থ নেই।'

'তা ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'সবচেয়ে জরুরী কাজগুলো তুমিই করো, কারণ তোমার মাথায় বুদ্ধি বেশি। তোমাকে নেতা বানিয়েছি আমরা সে-জন্যেই। কিন্তু একা তুমিই সব করবে, আর আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব, এটা ভাল লাগবে না। যে যেটা পারে, সেই মতই কাজ করা উচিত।'

'এখনও বেশি কিছু জানি না আমরা,' লেকচার দেয়ার ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'ফগও জানে বলে মনে হয় না। আমাদের মতই সে-ও বুড়োটাকে সন্দেহ করছে, তাই তার ওপর নজর রাখছে। বোঝা যাচ্ছে চোরের সঙ্গে যোগাযোগ আছে বুড়োটার। আরও একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়েছে, সবগুলো চোর গ্রীনহিলসে না থাকলেও ওদের অন্তত একজন এখানেই বাস করে। তাকে দেখেছি। তার সাইকেলে বেলের বদলে হর্ন লাগানো ছিল।'

'খুব সামান্য সূত্র,' রবিন বলল।

তার কথায় সায় জানিয়ে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। বলল, 'একটা কথা এখন আমরা জানি, যা ফগ জানে না, সেটা হলো কয়েক দিনের জন্যে বেঞ্চে বসবে না বুড়ো। আগামী কাল থেকে বুড়োর বদলে আমি বসব সেটাও জানে না।'

'তাতে কী?' মুসার প্রশ্ন।

'তাতে অনেক কিছু, পরে বুঝতে পারবে নিজেই,' ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজন মনে করল না কিশোর। 'আমি বসব বেঞ্চে, আর তোমরা বসবে লেমোনেড শপে। সবার একসঙ্গে বসার দরকার নেই, কিছুক্ষণ পর পর এসে একজন করে বসবে। একসঙ্গে বসলে ফগের সন্দেহ হতে পারে। তা ছাড়া বেশিক্ষণ থাকতেও পারবে না দোকানে। বসার জন্যে কোন একটা ছুতো দরকার। লেমোনেড আর কত খাওয়া যায়। বেশি খাওয়াটা সন্দেহজনক, পেটেও সইবে না। যে লোক মেসেজ দিতে আসবে তার সব কিছু ভালমত লক্ষ করবে- চেহারা, পোশাক-আশাক, ভঙ্গি, সব।'

মাথা কাত করল রবিন, 'করব।'

'আরও একটা কাজ আছে তোমাদের। হর্নওয়ালা লোকটাকে খুঁজে বের করা। করতে পারলে তার ওপর নজর রাখা যাবে। কার কার সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে জানা গেলে অন্য চোরদের চেনা সম্ভব হবে।'

'হর্নের সূত্র ধরে চোর খুঁজে বের করা মুশকিল। কতজনেরই সাইকেল আছে। কারটায় বেল লাগানো, কারটায় হর্ন, দেখার জন্যে সবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে তো

আর উঁকি দিতে পারব না।'

'সবার বাড়ি যাওয়া লাগবে না। সাইকেলের পার্টস বিক্রি করে যে দোকানে তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেই হবে কার কার কাছে হর্ন বেচেছে। হয়তো ওরা মনে করতে পারবে।'

'এটা অবশ্য পারা যায়। তবে তাতেও বিশেষ লাভ হবে বলে ম.ন হয় না।'

'হবে না ভেবে না করলে কোনদিনই হবে না। চেষ্টা তো করে দেখতে হবে।'

'কাল তা হলে মুসা আর ফারিহা যাক সাইকেলের দোকানে,' রবিন বলল, 'লেমোনেড শপে আমিই প্রথম বসি, কী বলো?'

'ঠিক আছে। টিটুকে দোকানে আনবে না। আমাকে দেখলে কাছে আসার জন্যে চেঁচামেচি করতে পারে। দেবে সব ভজকট পাকিয়ে।'

কথামত পরদিন বিকেলে দোকানে এসে ঢুকল রবিন। লেমোনেডের অর্ডার দিল। আগের দিনের মতই সাদা পোশাকে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল ফগ। ভুরু কুঁচকে তাকাল।

'আরি, আজও এসেছেন?' রবিন বলল হেসে। 'আমার মতই লেমোনেডের নেশায় পেয়ে গেছে বুঝি? ইউনিফর্ম পরেন না কেন? ছুটিতে আছেন?'

মনে মনে ভীষণ রেগে গেল ফগ। এই বিচ্ছুগুলোর জন্য কোথাও গিয়ে যদি একটু শান্তি পাওয়া যায়! রবিনের প্রশ্নের জবাবে ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দিতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু ইচ্ছে হলেই তো আর সব করা যায় না। অযথা চড় মারলে গিয়ে হয়তো নালিশ করে দেবে ক্যাপ্টেন রবার্টসনের কাছে। তখন চাকরি নিয়েই টানাটানি পড়বে। চড়ের বদলে দাঁত কড়মড় করে একটা কড়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই আপাতত সন্তুষ্ট রাখতে হলো নিজেকে। আবার চোখ ফেরাল কাগজের দিকে।

হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠল সে। বুড়ো জনসনকে হেঁটে আসতে দেখেছে।

দেখেছে রবিনও। অবাক হয়ে ভাবছে, কে এই বুড়ো? আসল জনসনই, নাকি কিশোর পাশা? মেসেজ পেয়ে সত্যি আসা বন্ধ করে দিয়েছে বুড়ো? বোঝার কোন উপায় নেই, একমাত্র কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করা ছাড়া।

বেঞ্চে বসে পকেট থেকে পাইপ বের করল বুড়ো। ধীরেসুস্থে তামাক ভরে আগুন ধরিয়ে টান দিল। কয়েকটা টান দিতেই শুরু হলো বেদম কাশি। কাশতে কাশতে বাঁকা হয়ে গেল একেবারে।

কাশি থামলে আবার পাইপ মুখে দিতে গিয়েও দিল না বুড়ো। ভয় পাচ্ছে, আবার যদি কাশি ওঠে?

ফগের দিকে তাকাল রবিন। খাতির জমানোর ভঙ্গিতে বলল, 'আজব বুড়ো, তাই না, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট? সেদিন যে গেলেন ওর বাড়িতে, জানলেন কিছু? বলল?'

জবাবে শব্দ করে কাগজ নাড়াচাড়া করতে লাগল ফগ।

দোকানের মালিক মহিলার দিকে তাকাল রবিন, 'বুড়োর নিশ্চয় খুব ঠাণ্ডা লেগেছে। দেখছেন, কেমন কাশছে। বুড়ো হওয়ার অনেক ঝামেলা নানা রকম রোগে ধরে।' ঝামেলা শব্দটার উপর বিশেষ জোর দিল সে, আড়চোখে তাকাল ফগের দিকে।

আর সহ্য করতে পারল না ফগ। লাল হয়ে গেছে গাল। ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ধমক দিয়ে বলল, 'দেখো ছেলে...'

বেঞ্চের দিকে চোখ পড়তেই থেমে গেল সে, হাঁ হয়েই রইল মুখ। আরও দু'জন লোক এসে বসেছে।

রবিনও তাকিয়ে দেখতে লাগল ওরা কী করে। কী ভাবে মেসেজ দেয় কিশোরের হাতে।

লোকগুলোর হাতে খবরের কাগজ। সেগুলো মেলে ধরে আলাপ করতে লাগল। একজন পাইপ ধরাল। থাকল কিছুক্ষণ। কিন্তু মেসেজ দিতে দেখা গেল না। লাঠিতে ভর দিয়ে বসেই আছে বুড়ো লোকটা। থেকে থেকে মাথা ঝাঁকাচ্ছে আপন মনে।

খানিক পরে সোজা হয়ে বসল সে। নাক ঝাড়ল। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে নাক মুছল। চোখ-মুখ কুঁচকে বিরক্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল লোকগুলো। কাগজ ভাঁজ করে উঠে চলে গেল।

নোটবুক বের করে তাতে দ্রুত কিছু লিখে নিল ফগ।

লোকগুলো যে চোর নয়, অনেক আগেই বুঝেছে রবিন। কারণ ওদের একজন তার বাবার বন্ধু।

আর কিছু ঘটছে না। সময় যাচ্ছে। একঘেয়ে লাগতে আরম্ভ করেছে রবিনের। মুসারা কী করছে ভাবতে লাগল।

মুসা আর ফারিহা ওদিকে পার্টসের দোকানে ঢুকেছে। সাইকেলের খুচরা যন্ত্রাংশ ছাড়াও টর্চ, খেলনা এবং আরও নানা রকম জিনিস বিক্রি হয় দোকানটায়। আসল মালিক নেই। বাইরে গেছে বোধহয়। বিক্রি করছে গাল-ফোলা একটা ছেলে।

মুসাদের দেখে এগিয়ে এল সে। বড়দের কায়দায় হেসে ফারিহাকে জিজ্ঞেস করল, 'কি লাগবে? পুতুল?'

'না,' জবাব দিল ফারিহা, 'একটা হর্ন দরকার। সাইকেলের বেলটা খারাপ হয়ে গেছে। এবার হর্ন লাগাব। অনেক জোরে বাজে। ভাল হর্ন আছে?'

'নিশ্চয় আছে। নতুন ধরনের জিনিস এসেছে। এই তো, গত হপ্তায় লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে নিয়ে এল আব্বা।'

'দেখি?'

তাক খুলে একটা হর্ন বের করে আনল ছেলেটা। ব্যাটারি ভরে সুইচ টিপতেই

বেজে উঠল।

'আসলেই ভাল,' মুসা বলল। 'খুব চলবে। বিক্রি করেছ আর?'

'করেছি, তবে বেশি না, মাত্র তিনটে। লোকে এখনও জানে না।'

'সবারই সাইকেল আছে? নাকি এমনি বাজাতে নিয়েছে?'

'কী যে বলো,' হাসল ছেলেটা। 'হর্ন এমনি এমনি নিতে যাবে কেন? সাইকেলে লাগাতেই নিয়েছে।'

'সাইকেলগুলো দেখেছ?'

'তা দেখিনি। সাইকেল তো আর দোকানে ঢোকায় না। বাইরে রেখে আসে।'

এরপর কি বলবে ভেবে পেল না মুসা। বেশি আগ্রহ দেখালে সন্দেহ করে বসতে পারে ছেলেটা।

সমাধান করে দিল ফারিহা। বলল, 'অনেক জিনিস তোমাদের দোকানে। খুব বিক্রি হয় বুঝি?'

'হয়।'

'কত লোক জিনিস কিনতে আসে। তুমি একা সামলাতে পারো?'

'সব সময় একা থাকি না, আব্বাও থাকে। তবে একাও অসুবিধে হয় না।' গর্বের সঙ্গে বলল ছেলেটা, 'সামলাতে তো পারিই, যাদের কাছে বিক্রি করি তাদের চেহারাও মনে রাখতে পারি। টাকার হিসেবও কখনও ভুল করি না। সে-জন্যেই তো আমার ওপর দোকানের ভার দিয়ে নিশ্চিন্তে বেরিয়ে যায় আব্বা।'

'বাহ্, তাই নাকি? কিছু যদি মনে না করো, একটা পরীক্ষা হয়ে যাক। কার কার কাছে হর্ন বিক্রি করেছ বলো তো দেখি?'

'একজন থাকে হেলেন স্ট্রীটের মাথার বাড়িটাতে,' গড়গড় করে যেন মুখস্থ বলে গেল ছেলেটা। 'আরেকজনের চোখ দুটো অদ্ভুত- একটার রঙ নীল, আরেকটা বাদামী। লোকটাকে আগে আর দেখিনি এই এলাকায়। নাম জানি না। তবে দেখলে ঠিক চিনতে পারব। আর তৃতীয়জন মোটা একটা ছেলে। খুব তাড়াহুড়ো ছিল মনে হলো ওর।'

চট করে মুসার দিকে তাকাল ফারিহা। বুঝতে পেরেছে দু'জনেই, কিশোরের কথা বলেছে।

ছেলেটার প্রশংসা করল মুসা, 'আরিব্বাবা, সত্যিই পারো দেখছি! সব মনে থাকে!'

হর্নটা কিনে নিয়ে ছেলেটাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। এখানকার কাজ শেষ। লেমোনেড শপের দিকে চলল। অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে রবিন। তার জায়গায় ওদের একজনকে বসতে হবে।

রবিনের লেমোনেড শেষ। আরেকটা নিলে আরও খানিকক্ষণ বসা যায়, কিন্তু আর নিতে ইচ্ছে করছে না। কাছে এসে দাঁড়াল মহিলা। 'আর কিছু লাগবে?'

'না।' বলেই বুঝল রবিন, বোকামি করে ফেলেছে। 'হ্যাঁ' বলা উচিত ছিল। ফগ বলে উঠল, 'তাহলে আর বসে থাকার দরকার কি? চলে যাও।'

জোর করে বসে থাকতে পারে অবশ্য, এটা অপরাধ নয়, কিছু বলবার থাকবে না ফগের। কিন্তু সন্দেহ করে বসতে পারে। বুঝেও ফেলতে পারে তারই মত বেঞ্চের দিকে নজর রেখেছে রবিন।

তাকে বাঁচিয়ে দিল মুসারা। দোকানে ঢুকল ওরা।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রবিন। হাত নেড়ে ডাকল, 'মুসা, আমি এখানে। এদিকে এসো। তোমাদের জন্যেই বসে আছি।'

ঝামেলা! রাগ চাপা দিয়ে চুপ হয়ে যেতে বাধ্য হলো ফগ। একটাকেই তাড়াতে পারল না, উল্টে তার অন্য সঙ্গীগুলোও এসে হাজির হয়েছে। নাহ্, এগুলোর জ্বালায় শান্তিতে কাজ করার আর উপায় নেই!

ওকে যে তাড়াতে চেয়েছে, চাপা গলায় মুসাকে জানিয়ে রবিন বলল, 'তুমি থাকো। আমরা যাই। কিছুক্ষণ পর ফারিহাকে পাঠিয়ে দেব। লেমোনেড খাওয়া বন্ধ করবে না। করলেই উঠে যেতে বলবে ঝামেলা।'

হাসল মুসা। 'আমাকে বলবে? দরকার হলে সারারাত ধরে খেয়ে যাব। মহিলার দোকান বন্ধ করা আটকে দেব।'

বিশ্বাস করল রবিন। সে ক্ষমতা মুসার আছে। ফগকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'আমার গলা শুকিয়ে গেছে। লেমোনেড খাব। তোমরা?'

'আমি খাব না,' হাত নাড়ল রবিন, 'অনেক খেয়েছি। যাব এবার।'

'তা হলে চলো আমরা চলে যাই,' ফারিহা বলল। 'মুসা থাকুক। খেয়ে আসবে।'

ফারিহা আর টিটুকে নিয়ে বেরিয়ে গেল রবিন।

ছয়

লেমোনেড শপে বসে বিরক্তিকর সময় কাটছে মুসার। খাওয়াটাও একঘেয়ে লাগছে। বাইরে বেঞ্চে বসে আছে বুড়ো। কেউ আসছে না ওর কাছে। পেছনে বসে আছে ফগ। ওই লোকটা আরেক যন্ত্রণা। মুসার মনে হচ্ছে তার ঘাড়ের দিকেই সর্বক্ষণ তাকিয়ে আছে সে।

আরেক টুকরো বরফ আনবার অর্ডার দিল মুসা।

'তোমরা মনে হচ্ছে দোকানটাকেই বাড়ি বানিয়ে ফেলবে,' বলে উঠল ফগ। 'যে-ই আসছ, ওঠার আর নাম নেই।'

রেগে গেল মুসা 'আপনার কোন অসুবিধে হচ্ছে? আপনিও তো বসে আছেন।'

জবাব দিতে পারল না ফগ। বিড়বিড় করে বলল কেবল, 'ঝামেলা!'

খোঁচা দিয়ে মুসা বলল, 'এখানে এই গরমের মধ্যে নিশ্চয় ভাল লাগছে না আপনার, মিস্টার ফগ...'

'ফগর‍্যাম্পারকট!' গাল লাল হয়ে গেল ফগের। বার বার ভুল করে ছেলেটা, শুধরে দিতে হয়। নাকি ইচ্ছে করেই এ রকম করে? ক্যাপ্টেনের ভয়ে কেবল পারে না ফগ। ভাবে, অতিরিক্ত আশকারা দিয়ে মাথায় তুলে ফেলেছেন, নইলে কবে চড়িয়ে ঠিক করে দিত সে।

'সরি, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট, নদীর ধারে চলে গেলেই পারেন। ওখানে অনেক ঠাণ্ডা। দোকানের মধ্যে বসে অহেতুক মূল্যবান ছুটিটা নষ্ট করছেন।'

মনে মনে আরও রেগে গেল ফগ। মন চাইছে, মশা হয়ে যাক এখন মুসা, যাতে এক থাপ্পড়ে তাকে শেষ করে দিতে পারে। কিন্তু মন চাইলেই তো আর সব কিছু হয় না।

এই সময় দোকানে ঢুকল ফারিহা। তার পাহারা দেয়ার পালা এসেছে।

হাঁপ ছাড়ল মুসা। জঘন্য এই দোকানটা থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে বাঁচে। ফগ না থাকলে অত অস্বস্তি লাগত না। ফারিহাকে জিজ্ঞেস করল, 'আবার এসেছ কেন?'

'কি করব?' আড়চোখে ফগের দিকে তাকাল একবার ফারিহা। 'রবিন চলে গেছে বাড়িতে, কি নাকি জরুরী কাজ আছে। একা একা বসে থাকতে ভাল লাগল না। ভাবলাম, এখানে তুমি আছ। একটা লেমোনেডও খাওয়া যাবে।'

'কিন্তু আমি তো তোমাকে সঙ্গ দিতে পারব না। আমারও কাজ আছে। একাই খেতে হবে তোমাকে।' দুই ঢোকে গেলাসের লেমোনেডটুকু শেষ করে উঠে দাঁড়াল মুসা। দরজার দিকে এগোল।

মুসার শূন্য চেয়ারটাতে বসল ফারিহা। ফগকে ভয় পায় সে, ফিরে তাকানোর সাহস পেল না।

ফগ ভাবছে, এই ছেলেমেয়েগুলোর হাত থেকে তার মুক্তি নেই। একজন যাচ্ছে তো আরেকজন আসছে। এমন অদ্ভুত কাণ্ড করছে কেন ওরা?

ফারিহা ভাবছে, একা একা একভাবে বসে থাকতে কি বিরক্তিটাই না লাগছে কিশোরের।

হঠাৎ কাশতে আরম্ভ করল কিশোর। শেষ আর হয় না। কোটের পকেট হাতড়াতে লাগল রুমালের জন্যে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বের করে আনল পুরানো একটা লাল রুমাল। নাক-মুখ মুছল। তারপর আবার লাঠিতে ভর দিয়ে বসল। উঠে বাড়ি চলে যাবে কিনা ভাবছে যেন।

বিকেলটা শেষ হলো অবশেষে। নতুন কিছু ঘটল না। দোকান থেকে বেরিয়ে গেল ফারিহা। কয়েক মিনিট পর কিশোরও উঠে পড়ল। সবার শেষে দোকান থেকে বেরোল ফগ।

মুসাদের ছাউনিতে এল কিশোর। অন্য তিনজন আগেই ঢুকে বসে আছে।

কিশোর বলল, 'কাল খবরের কাগজ নিয়ে যাব। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এ ভাবে বসে থাকা যায় না!'

সাইকেলের দোকানে কী করে এসেছে কিশোরের কাছে বলার জন্যে অস্থির হয়ে ছিল ফারিহা। বলল, 'কিছু সূত্র আমরা পেয়েছি। তুমি বাদে আরও দু'জন হর্ন কিনেছে। একজন থাকে হেলেন স্ট্রীটের মাথায়। আরেকজন কোথায় থাকে জানা যায়নি। তার চোখ অদ্ভুত—একটা নীল, আরেকটা বাদামি।'

'মাত্র তিনটে হর্ন বিক্রি করেছে?' অবাক হলো কিশোর।

'হ্যাঁ,' মুসা বলল। 'নতুন মডেলের হর্ন, হপ্তাখানেক হলো আনিয়েছে। তুমি বাদে আর দু'জনকে সন্দেহ হয়।'

'আমাকেও হয় নাকি?'

'আরে দূর, তোমাকে হবে কেন? বলছি, তুমি বাদ। তাহলে বাকি থাকে মাত্র দু'জন। তাদেরও একজনের ঠিকানা জানি, আরেকজনের জানি না।'

'সুতরাং যারটা জানি তার খোঁজই আগে নিতে হবে। হেলেন স্ট্রীটে যাব আমরা।'

'আজ আর হবে না। দেরি হয়ে গেছে। কাল যাব, কী বলো?'

'হ্যাঁ, সকালের দিকে যাওয়া যায়। দশটা নাগাদ। বেঞ্চে বসব তো দুপুরের পর।'

পরদিন সকাল কাঁটায় কাঁটায় দশটায় বেরিয়ে পড়ল গোয়েন্দারা। হেলেন স্ট্রীটের শেষ মাথার বাড়িটা খুঁজে বের করতে বেগ পেতে হলো না। ছোট সুন্দর একটা বাগানের পর একটা ছোট বাংলো। পেছনে ছাউনিও আছে একটা।

'সাইকেলটা থেকে থাকলে ওই ছাউনিতে আছে,' কিশোর বলল। 'দেখা যায় কী করে, বলো তো?'

পকেট থেকে একটা টেনিস বল বের করল মুসা। 'আমি এটা বাগানে ছুঁড়ে মারব। তারপর আনতে যাওয়ার ছুতোয় ঢুকে পড়ব সবাই। আমি বল খুঁজে বেড়াব, এই ফাঁকে তুমি ছাউনিতে উঁকি মেরে আসবে। লোকটা বেরোলে, আর সেই লোকটা হলে, তাকেও চিনতে পারব।'

বুদ্ধিটা পছন্দ হলো সবার। পেছনের আঙিনার দিকে বলটা ছুঁড়ে দিল মুসা।

মুহূর্ত দেরি না করে গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল সবাই। খোঁজাখুঁজি করবার আগে অনুমতি নিয়ে নেওয়া উচিত। বাড়ির দরজায় টোকা দিল মুসা। খুলে দিল একজন মহিলা। মুসা বলল, 'আমাদের বলটা পড়েছে আপনাদের বাগানে। প্লীজ,

একটু খুঁজব।'

'খোঁজো,' অনুমতি দিয়ে দিল মহিলা। 'ফুলের বেডগুলো নষ্ট কোরো না যেন।' দরজা লাগিয়ে দিল আবার।

ঘুরে বাড়ির পেছনের আঙিনায় চলে এল ওরা।

একজন লোক মাটি খুঁড়ছে। জিজ্ঞেস করল, 'কী চাও?'

বিনীত স্বরে কিশোর বলল, 'আপনার স্ত্রীর কাছে বলেই ঢুকেছি। আমাদের বলটা পড়েছে এখানে কোথাও। সেটা খুঁজতে এসেছি।'

'নিয়ে যাও।'

আবার মাটি খোঁড়ায় মন দিল লোকটা।

ছাউনির কাছে এগিয়ে গেল কিশোর চারপাশে ঘুরে খুঁজবার ভান করল। দরজা খোলাই আছে। উঁকি দিল ভিতরে। বাগানে কাজ করবার যন্ত্রপাতি আছে অনেক, পুরানো বস্তা আছে, কিন্তু কোন সাইকেল নেই।

কিশোরের ঘাড়ের কাছে প্রশ্ন হলো, 'কী হলো, পাওনি?'

ফিরে তাকাল সে। মাটি খোঁড়া বন্ধ করে উঠে এসেছে লোকটা।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, পেয়েছি। এই যে,' জবাব দিল কিশোর। 'আপনাদের ছাউনিটা কিন্তু সুন্দর। আমাদের যদি এমন একটা থাকত, সাইকেল রাখতে পারতাম।'

'আমরা সাইকেল রাখি না। যন্ত্রপাতি রাখি।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। যাই হোক, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।' বন্ধুদের ডেকে বলল কিশোর, 'এই, বল পেয়েছি। চলো, যাই।'

রাস্তায় বেরিয়ে বলল সে, 'সাইকেল নেই। দোকানের ছেলেটা যখন বলেছে এ বাড়ির লোকের কাছেই হর্ন বিক্রি করেছে, তাহলে নিশ্চয় আছে। কোথায় রেখেছে ওটা? ছাউনি বাদ দিলে ঘরে রাখতে হবে। ওখানে কেন?'

'সন্দেহজনক,' মন্তব্য করল মুসা।

রাস্তার মোড়ের কাছে আসতে অন্য পাশ থেকে শোনা গেল হর্নের শব্দ। চমকে গেল ওরা। হর্ন! তবে কি অদ্ভুত চোখওয়ালা লোকটা আসছে?

কিন্তু না। ওদেরকে হতাশ করে ঘন ঘন হর্ন বাজিয়ে তীব্র গতিতে বেরিয়ে এল একটা ট্রাইসাইকেল। একটা ছেলে চালাচ্ছে। সোজা এসে কিশোরের পায়ের উপর চাকা তুলে দিল।

বিকট চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'উফ্, ভেঙে ফেলেছে! এই,ছেলে, গাধা কোথাকার! মোড়ের মধ্যে অমন করে চালায় নাকি মানুষ!'

'কেন, আমি তো হর্ন দিচ্ছিলাম!' সমান তেজে জবাব দিল ছেলেটা। 'তুমি শুনলে না কেন? সরে যেতে পারোনি?'

'আমরা ভেবেছি বড়দের সাইকেল,' কড়া গলায় বলল মুসা। 'ট্রাইসাইকেল নিয়ে তুমি বেরোবে কে জানত!'

'সরি,' নরম হয়ে এল ছেলেটা। 'হর্নটা নতুন কিনেছি তো, বাবা কিনে দিয়েছে। বাজেও ভাল। বাজাতে বাজাতে আর হুঁশ ছিল না। তা ছাড়া ভাবলাম, এত জোরে বাজে যখন লোকে তো শুনতে পাবেই, সরে থাকবে।'

প্যাডাল ঘোরাতে শুরু করল সে।

ছেলেটা কোথায় যায় দেখতে লাগল গোয়েন্দারা। যে বাড়ি থেকে এইমাত্র বেরিয়ে এসেছে ওরা, অর্থাৎ হেলেন রোডের মাথার বাড়িটার গেট দিয়ে ঢুকে পড়ল সে।

'হুঁ, তা হলে এই ব্যাপার,' মাথা নাড়তে নাড়তে বলল কিশোর। 'একটা হর্ন কে কিনেছে বোঝা গেল। অহেতুক সময় নষ্ট করলাম এখানে এসে। মাঝখান থেকে আমার পা-টা গেল।'

'ভালই তো হলো,' মুচকি হেসে বলল মুসা। 'বিকেল বেলা তো এমনিতেও খোঁড়াতে হত। অভিনয়টা আর করা লাগল না।'

মুসাদের বাড়িতে ফিরে এল ওরা। আলোচনায় বসল। আরেকটা হর্ন কার, সেটা বের করবার কোন উপায় দেখতে পেল না।

'মনে হচ্ছে এই রহস্যের সমাধান আমরা করতে পারব না কোনদিন,' ফারিহা বলল। 'যে হারে এগোচ্ছে, কিছু করার আগেই স্কুল খুলে যাবে।'

'তা বটে,' মুসাও একমত হলো। 'ছুটি আর বেশিদিন নেই।'

মন অতটা ছোট করতে পারল না রবিন। বলল, 'বলা যায় না, কিছু ঘটেও যেতে পারে। তখন সুবিধে হবে আমাদের।'

'হবে কিনা সেটাই তো বুঝতে পারছি না!' ভাগ্যের ওপর কোন কিছু ছেড়ে দিতে ভাল লাগে না কিশোরের।

বিকেল হতে অনেক দেরি। এতক্ষণ বসে থাকতে ইচ্ছে করল না ওদের। ঠিক হলো, নদীতে যাবে সাঁতার কাটতে।

নদীতে আসতে দেরি হলো না। ফারিহা তেমন ভাল সাঁতার জানে না। সে অল্প পানিতে টিটুকে নিয়ে দাপাদাপি করতে লাগল। অন্য তিনজন সাঁতার কাটতে কাটতে সরে গেল দূরে।

ফারিহার মনে হলো, আরেকটু দূরে যাবে। তীরের অত কাছে থাকতে ভাল লাগছে না। সরতে শুরু করল সে। সাঁতারে এতই মগ্ন, নিঃশব্দে যে ভেসে আসছে একটা শালতি নৌকা, খেয়ালই করল না। তীক্ষ্ণ ব্যথা লাগল কাঁধে। চিৎকার করে উঠল সে। কিসে ধাক্কা দিয়েছে দেখতে দেখতেই নৌকাটা সরে গেল।

পেছনে আসছিল আরেকটা নৌকা। শাঁই করে মোড় নিয়ে এগিয়ে এল তার দিকে। কাছে এসে বৈঠা ফেলে ঝুঁকে ফারিহার হাত ধরে ফেলল চালক। জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক আছ তো তুমি? সাঁতার জানো?'

'জানি,' নাক-মুখ দিয়ে পানি ছাড়তে ছাড়তে কোনমতে জবাব দিল ফারিহা।

পানিতে থাবা মেরে চিৎকার করে উঠল, 'কিশোর! মুসা! জলদি এসো!'

দ্রুত এগিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। টেনেটুনে ভীত ফারিহাকে তীরে তুলে আনল।

নদীর দিকে তাকাল ফারিহা। হতাশ কণ্ঠে বলল, 'গেল মিস হয়ে একটা ভাল সূত্র! কিশোর, যে লোকটা আমাকে ধরেছে তার একটা চোখ নীল, আরেকটা বাদামী! বাড়ি খেয়ে এমন অবস্থা হয়েছিল আমার, নৌকার নামটাও দেখতে পারিনি!'

'তাই নাকি!'

সবাই তাকাল নৌকাটার দিকে। অনেক দূরে চলে গেছে।

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কি রঙ ছিল, তা-ও দেখোনি? এমন কিছু, যাতে চেনা যায়?'

মাথা নাড়তে নাড়তে ফারিহা বলল, 'না, কিচ্ছু দেখিনি! এত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম···আহ্, গেল সব! সূত্রও গেল, লোকটাও গেল, কোনটাই আর পাওয়া যাবে না!'

সাত

দুপুরে খেয়েদেয়ে বুড়োর ছদ্মবেশে আবার গাঁয়ের ভেতর বেঞ্চে বসতে রওনা হলো কিশোর। হাতে একগাদা খবরের কাগজ। আজ আর অহেতুক বসে ঝিমানোর ভান করতে রাজি নয়।

রবিন ঢুকল লেমোনেড শপে।

আগের দিনের মতই আগের চেয়ারটাতে বসে আছে ফগ। কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে।

কেয়ার করল না রবিন। জানালার কাছে বসে লেমোনেডের অর্ডার দিল। আজ আর বোকামি করবে না। যতটা সম্ভব দেরি করবে লেমোনেড শেষ করতে। বেরিয়ে যাওয়ার কথা বলবার কোন সুযোগই দেবে না ফগকে।

খবরের কাগজগুলো পাশে রেখে লাঠিতে ভর দিয়ে ঘুমিয়ে পড়বার ভান করল কিশোর।

হাই তুলতে লাগল রবিন। দোকানের ভিতরটা বদ্ধ, হাওয়া-বাতাস তেমন নেই। ঝিমুনি আসছে তার। ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। ঠিক এই সময় নজরে পড়ল লোকটাকে। ছায়ায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে ছদ্মবেশী কিশোরের দিকে।

মুহূর্তে সজাগ হয়ে গেল সে।

সজাগ হয়ে গেল ফগও। পিঠ সোজা করে বসল

রাস্তার এ মাথা ওমাথা দেখল লোকটা। সিগারেট ধরাল। টানতে লাগল জোরে জোরে।

বিকেলের এই প্রচণ্ড গরমে জনশূন্য হয়ে আছে রাস্তাটা। অলস ভঙ্গিতে চলে গেল একটা গাড়ি। মোড় থেকে বেরিয়ে এসে গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়ল একটা কুকুর। প্রায় দম বন্ধ করে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল রবিন আর ফগ।

হাঁটতে শুরু করল লোকটা। রাস্তা পার হয়ে গিয়ে একটা লোহালক্কড়ের দোকানের জানালার দিকে তাকাল। কয়েক মিনিট একভাবে তাকিয়ে থেকে আবার পা বাড়াল। গিয়ে বসে পড়ল কিশোরের বেঞ্চে।

দুনিয়ার কোন দিকেই যেন খেয়াল নেই কিশোরের, ছায়ায় বসে আরাম করে ঝিমাচ্ছে। কিন্তু চোখের কোণ দিয়ে ঠিকই দেখতে পেয়েছে লোকটাকে। আচমকা ঝটকা দিয়ে সোজা হলো সে। কাশতে শুরু করল। বেদম কাশি। কোন মতেই থামতে চায় না। নাক-চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে গেল। পকেট থেকে পুরানো লাল রুমালটা বের করে মুছল।

'সাংঘাতিক কাশি তো আপনার!' লোকটা বলল।

জবাব দিল না কিশোর। তাকালও না।

'সাংঘাতিক কাশি তো আপনার!' স্বর চড়িয়ে বলল লোকটা।

আস্তে করে ঘুরে তাকাল কিশোর। একহাত নিয়ে গেছে কানের পেছনে। বুড়োর স্বর নকল করে বলল, 'কী বলছেন?'

হেসে উঠল লোকটা। সিগারেট কেস বের করে বাড়িয়ে দিল কিশোরের দিকে। একটা মাত্র সিগারেট অবশিষ্ট আছে। কিশোর সেটা নিয়ে নিতেই পকেট থেকে নতুন প্যাকেট বের করে সিগারেট ভরতে শুরু করল কেসে।

'থ্যাংক ইউ, স্যার,' ঘড়ঘড়ে স্বরে বলে সিগারেটটা পকেটে রেখে দিল কিশোর। দ্রুত হয়ে গেছে হৃৎপিণ্ডের গতি। ধরা পড়বার ভয়ে সরাসরি তাকাতে পারছে না লোকটার দিকে। আশা করল, রবিন সবই দেখতে পাচ্ছে। খুঁটিয়ে দেখবে সব। দেখবে তো?

হ্যাঁ, দেখছে রবিন। ফগও দেখছে। লোকটার পরনে ধূসর ফ্ল্যানেলের সুট, নীল শার্ট, কালো জুতো, ধূসর ফেল্ট হ্যাট। টাই নেই। গোঁফ আছে। লম্বা, ছিপছিপে শরীর। লম্বা নাক। ছোট ছোট চোখ।

উঠে দাঁড়াল লোকটা। দ্রুত হেঁটে চলে গেল মোড়ের ওপাশে।

কিশোর ভাবল, তারও তাড়াতাড়ি কেটে পড়া উচিত—ফগ এসে সিগারেটটা কেড়ে নেওয়ার আগেই। সুতরাং সে-ও উঠে দাঁড়াল। লোকটার মত না হলেও পা টানতে টানতে বেশ দ্রুতবেগেই অদৃশ্য হয়ে গেল মোড়ের আড়ালে।

এই সময় চোখে পড়ল লোকটাকে। থমকে গেল সে। এটা আশা করেনি।

উল্টো দিক থেকে এগিয়ে আসছে বুড়ো জনসন। নির্দেশ মানেনি। বেঞ্চের ছায়ার লোভ সামলাতে পারেনি বোধহয়, বসতে চলেছে।

ওর নজরে পড়তে চায় না কিশোর। সব গোলমাল হয়ে যাবে তা হলে। লুকানোর জায়গা খুঁজতে লাগল। চোখে পড়ল একটা বাড়ির গেট। চট করে ভিতরে ঢুকে লুকিয়ে পড়ল ঝোপের আড়ালে।

একেবারে সময়মত ঢুকেছে। বুড়োটা এসে বলতে গেলে বাঁচিয়েই দিয়েছে তাকে। ভাগ্য বিশ্বাস করতে চায় না কিশোর, কিন্তু ভাগ্যক্রমে কাকতালীয় ভাবেই ঘটে গেল ঘটনাটা। সে ঢুকবার পরক্ষণেই মোড়ের অন্যপাশ থেকে ছুটে বেরিয়ে এল ফগর্‍্যাম্পারকট।

তাকে দেখে পাশ কেটে সরে যেতে চাইল বুড়ো। কিন্তু পথ আটকাল ফগ। হাঁপাতে হাঁপাতে কঠিন গলায় বলল, 'সিগারেটটা দাও!'

তাজ্জব হয়ে গেল বুড়ো। সাদা পোশাকে থাকায় ফগকে চিনতে পারল না। কীসের সিগারেট চাইছে লোকটা?

'দিলে না!' ধমকে উঠল ফগ।

'কী বলছেন?' কানের পেছনে হাত নিয়ে গেল বুড়ো।

পেছনে পায়ের শব্দ শুনে ফিরে তাকাল ফগ। রবিনকে আসতে দেখল।

কিশোরকে ধরেছে মনে করে ভয় পেয়ে গেল রবিন। দাঁড়িয়ে গেল। কী করা যায়, ভাবছে।

চিৎকার করে বলল বুড়ো, 'অযথা বিরক্ত করছেন আমাকে আপনি! আমি থানায় যাব, পুলিশের কাছে যাব!'

'পুলিশের সামনেই তো আছ, চাঁদ! চিনতে পারছ না? আমি ফগর্‍্যাম্পারকট। বেশি কথা না বলে সিগারেটটা দাও বলছি!'

বোকা হয়ে গেল বুড়ো। এতক্ষণে ফগকে চিনতে পেরে ভয়ে কুঁকড়ে গেল। কোন সিগারেটের কথা বলছে বুঝতে পারল না সে। তার কাছে কোন সিগারেট নেই। বলল, 'সিগারেট তো নেই, পাইপ আছে। ওটা নিয়ে আমাকে রেহাই দিন। সত্যি বলছি, কসম, আমি কিছু করিনি!'

ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল ফগ। বুড়োর কলার চেপে ধরে বলল, 'থানায় গেলেই বুঝবে কিছু করেছ কিনা!' টানতে টানতে বেচারা বুড়োকে নিয়ে চলল সে।

কিশোরকে নিয়ে যাচ্ছে ভেবে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল রবিন।

'রবিন, এই রবিন!'

ডাক শুনে আরও চমকে গেল রবিন। মুসা হলে ভূতের ভয়ে চিৎকার করে উঠত এতক্ষণে। এদিক ওদিক তাকাতেই চোখে পড়ল ঝোপের ভিতর থেকে তাকিয়ে আছে আরেক বুড়োর মুখ।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'ওরা চলে গেছে?'

'তুমি! আমি তো ভেবেছিলাম তোমাকেই নিয়ে গেছে! হ্যাঁ, চলে গেছে।'

ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। বলল, 'বুড়োটাকে আসতে দেখে লুকিয়ে পড়েছিলাম। বাঁচিয়ে দিল! বুড়োটার বোধহয় ঘরে থাকতে ভাল্লাগছিল না।'

'হ্যাঁ, তাই হবে। কিশোর, সিগারেটে কোন মেসেজ আছে? দেখেছ?'

'এখনও দেখিনি। নিরাপদ জায়গায় না গিয়ে বের করব না। জলদি চলো, মুসাদের বাড়িতে।'

আগে আগে চলল রবিন, পাহারা দিতে দিতে। ফগকে আসতে দেখলেই কিশোরকে লুকিয়ে পড়বার ইঙ্গিত দেবে। ভাগ্য ভাল, প্রচণ্ড গরমে লোকজন সব ঘরে আটকে বসে আছে। রাস্তায় ওরা দু-জন বাদে কেউ নেই।

দশ মিনিটের মধ্যেই মুসাদের বাগানে ঢুকল ওরা। ছাউনিতে ঢুকল। কাপড় খুলল না কিশোর। খুললে পরবার কিছু নেই আর। সব কাপড় বাড়িতে রেখে এসেছে।

উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছিল মুসা এবং ফারিহা। কিশোর আর রবিনের মুখ দেখেই বুঝে ফেলল কিছু ঘটেছে। কী ঘটেছে জানতে চাইল।

সব ওদেরকে বলল কিশোর আর রবিন।

পকেট থেকে সিগারেটটা বের করল কিশোর। দেখবার জন্য সবাই ঘিরে এল তাকে। টিটু ঢুকে পড়ল ফাঁক দিয়ে, একেবারে কিশোরের সামনে বসল।

হেসে ফেলল ফারিহা। 'বসেছে কী রকম দেখো! একেবারে মহাপণ্ডিত!'

অন্য সময় হলে এটা নিয়ে বেশ হাসাহাসি করত ওরা। কিন্তু এখন উত্তেজিত। সিগারেটে কী আছে দেখতে চায়।

হাতে নিয়ে সিগারেটটা দেখল কিশোর। ভিতরে তামাকের বদলে রয়েছে পাকানো কাগজ। ওপরের মোড়কটা সাবধানে ছিঁড়ে ভিতরের কাগজটা বের করল। হাতের তালুতে চেপে চেপে সমান করল।

কী লেখা আছে দেখবার জন্য সবাই আরও ঠাসাঠাসি করে এল। একজনের নিঃশ্বাস লাগছে আরেকজনের গালে। লেখা রয়েছে:

এক টিন কালো রঙের বুট-পালিশ।
এক পাউন্ড চাল।
এক পাউন্ড চা পাতা।
দুই পাউন্ড সিরাপ।
এক বস্তা ময়দা।

'এ কী!' অবাক হয়ে বলল রবিন, 'এ তো মুদি দোকানের লিস্ট! মানে কি এর, কিশোর?'

'জানি না। কোন ধরনের কোড হতে পারে, সাঙ্কেতিক ভাষা।' নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। নিজেকেই যেন বোঝাল, 'কিন্তু কোড হলে তো কঠিন হবে

যায়। বুড়োর মাথায় ধরবে না। তাকে বোঝাতে হলে সহজ কিছু বলে বোঝাতে হবে। এই লেখা কেন?'

'আচ্ছা,' বলে উঠল মুসা, 'অদৃশ্য কালি দিয়ে লেখেনি তো! বাইরে থেকে কাগজটা দেখলে মনে হবে মুদির লিস্ট, আসল মেসেজ হয়তো ভেতরে লেখা আছে!'

'হ্যাঁ, থাকতে পারে। চট করে গিয়ে তোমাদের ইস্ত্রিটা নিয়ে এসো।'

দৌড়ে গেল মুসা। ইস্ত্রি নিয়ে ফিরে এল।

ইস্ত্রি গরম করে চেপে ধরা হলো কাগজের উপর। ঠিকই আন্দাজ করেছে মুসা। কাগজে ফুটে উঠল আরেকটা লেখা,

মোমের পুতুলকে বোলো।
মোমের প্রদর্শনী, মঙ্গলবার, রাত ৯টা।
–কাঠের পুতুল।

'বোঝা গেছে!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'মোমের পুতুল আর কাঠের পুতুল দুটোই সাঙ্কেতিক নাম!'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'নদীর ধারে মেলায় যেখানে মোমের পুতুলের প্রদর্শনী হচ্ছে, সেখানে রাত নয়টায় মোমের পুতুল নামে লোকটাকে দেখা করতে বলেছে কাঠের পুতুল নামে লোকটা।'

'কীসের জন্যে, কিশোর?' ফারিহার প্রশ্ন।

'জানি না। তবে জানতে হবে। মঙ্গলবার রাত নয়টায় আমরাও যাব সেখানে!' ঘোষণা করল কিশোর।

আট

গোয়েন্দারা যখন মেসেজ উদ্ধারে ব্যস্ত, ফগ তখন বুড়ো জনসনের কাছ থেকে সিগারেটটা উদ্ধারের চেষ্টা করছে। বার বার জিজ্ঞেস করছে ওটা কোথায়।

বুড়োর একই জবাব, কীসের সিগারেট, সে জানে না।

ভীষণ রেগে গিয়ে ফগ গর্জে উঠল, 'না বলা পর্যন্ত ছাড়ছি না তোমাকে! থাকো এখানে! পচো!'

কাকুতি-মিনতি করতে লাগল বুড়ো–সে কিছু জানে না। আজ বেঞ্চেই বসেনি।

বিশ্বাস করাতে পারল না ফগকে। বুড়োকে হাজতে তালা দিয়ে রেখে বেরিয়ে এল। ভাবল, রবিনকে জিজ্ঞেস করতে যাবে, সে আর কিছু দেখেছে কিনা?

সিগারেটটা কোথায় লুকাতে পারে বুড়ো, সেটাও জিজ্ঞেস করবে।

সাদা পোশাকে থাকবার আর দরকার নেই। ইউনিফর্ম পরে বেরোল ফগ।

রবিনদের বাড়িতে ওকে পাওয়া গেল না। তার মা মুসাদের বাড়িতে খোঁজ নিতে বললেন ফগকে।

মুসাদের গেটের সামনে এসেই থমকে দাঁড়াল ফগ। হাঁ হয়ে গেল মুখ। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। গেট দিয়ে বেরিয়ে আসছে বুড়ো জনসন। এ কি করে সম্ভব! নিজের হাতে হাজতে তালা দিয়ে রেখে এসেছে বুড়োকে। ছাড়া পেয়ে এখানে চলে এল কি করে? ও যে বুড়ো নয়, কিশোর, কল্পনাই করতে পারল না।

খপ করে বুড়োবেশী কিশোরের হাত চেপে ধরল সে। 'বেরোলে কী করে, অ্যাঁ? পেটে পেটে অনেক তো শয়তানি! এসো আজ, দেখাব মজা!'

কানের কাছে হাত নিয়ে গেল কিশোর। বুড়োর মত করে বলল, 'কী হয়েছে?'

কোটের কলার চেপে ধরে টানতে টানতে কিশোরকে নিয়ে এল ফগ। হাজতের তালা খুলে ধাক্কা দিয়ে ফেলল ভিতরে। বাইরের আলো থেকে আসায়, আর উত্তেজনায় এককোণে জবুথবু হয়ে বসে থাকা আসল বুড়োটাকে লক্ষই করল না।

কিন্তু কিশোর করল। করল বুড়ো জনসনও। নিজের চেহারার আরেকজনকে দেখে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল বোবা হয়ে। তারপর বিকট চিৎকার করে উঠল।

ফিরে তাকাল ফগ। এইবার দেখতে পেল দু-জনকেই। বোকা হয়ে গেল সে-ও। একটা বুড়ো দুটো হয়ে গেল কী করে বুঝতে পারল না! মনে হলো দুঃস্বপ্ন দেখছে।

আবার হাজতের তালা খুলে ভিতরে ঢুকল সে।

কিশোর বুঝল, অনেক হয়েছে, আর লুকোচুরির চেষ্টা করে লাভ নেই। বলল, 'মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট, আমি বুড়ো নই, কিশোর পাশা।'

'ঝামেলা!' নিচের চোয়াল ঝুলে পড়ল ফগের। হচ্ছেটা কী? ঢোক গিলল সে।

ধীরে ধীরে নকল চুল-দাড়ি খুলে নিল কিশোর। বেরিয়ে পড়ল আসল চেহারা।

খপ করে তার হাত চেপে ধরে হ্যাঁচকা টানে হাজতের বাইরে এনে ফেলল ফগ। বুড়োকে ভিতরে রেখে দরজায় তালা লাগিয়ে কিশোরকে নিয়ে এল অফিসে। কঠিন গলায় ধমক দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এইবার বলো সব, যদি জেলে পচতে না চাও!'

'সে এক দীর্ঘ কাহিনী, মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট,' নাটকীয় ভঙ্গিতে শুরু করল কিশোর। কোন কথা লুকানোর প্রয়োজন মনে করল না। সবই বলল, কী করে

ফাঁদ পেতেছিল চোরের দলের জন্য।

'হুঁ, ঝামেলা!' সব শুনবার পর বলল ফগ। 'সিগারেটটা কোথায়? ওটাতে মেসেজ রয়েছে, না?'

'কী জানি,' গাল চুলকাল কিশোর। এই একটা কথা ফাঁস করতে রাজি নয় সে। পকেট থেকে কাগজটা বের করে দিয়ে বলল, 'সিগারেটের ভেতরে তামাকের বদলে এই কাগজটা ছিল। মুদি দোকানের লিস্ট। কিছুই বোঝা যায় না।'

ছোঁ মেরে কাগজটা কেড়ে নিল ফগ। নীরবে পুরো একটা মিনিট তাকিয়ে রইল ওটার দিকে। তারপর মুখ তুলে বলল, 'এবার তুমি যেতে পারো। এটা আমার কাছে থাক।'

'কিছু বুঝলেন?'

'ঝামেলা! ভাল চাও তো ভাগো এখান থেকে! নইলে পুলিশের সঙ্গে চালাকির অপরাধে হাজতে ভরব!'

কিশোর ধরে নিল, কিছু বুঝতে পারেনি ফগ। অদৃশ্য কালিতে মেসেজ লেখা রয়েছে এটা বুঝতে পারবে না বোকা পুলিশম্যানটা। অহেতুক আর তাকে না খেপিয়ে বেরিয়ে এল সে। সোজা চলে এল মুসাদের বাড়িতে। তাকে ধরে নিয়ে যেতে দেখেছে সবাই। উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। আলোচনা করছে, কী ভাবে তাকে ছাড়িয়ে আনা যায়?

সব বলতে লাগল কিশোর। হাজতে একই চেহারার দুই বুড়োকে দেখে ফগের কী অবস্থা হয়েছিল, অভিনয় করে দেখাল। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল সবাই। এত হাসির কী হলো বুঝতে পারল না টিটু। তাই বলে আনন্দ করা থেকে বঞ্চিত হলো না। খউ খউ করে চেঁচিয়ে, নেচে নেচে সবার হাত-মুখ চেটে দিতে লাগল।

'বুড়োটাকে কী করেছে?' জানতে চাইল মুসা।

'আটকে রেখেছে,' কিশোর বলল। 'চোরগুলোকে না ধরা পর্যন্ত ছাড়বে না। ভালই হয়েছে। নইলে হয়তো ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বলে দিত সব। চোরেরা তখন মীটিং বাতিল করে দিত।'

'তার মানে তুমি মঙ্গলবার রাতে মীটিঙে যাচ্ছই?' জিজ্ঞেস করল ফারিহা।

'নিশ্চয়।'

'আমার ভয় লাগছে। বিপদ হতে পারে। এখুনি গিয়ে ক্যাপ্টেনকে সব বলে দেয়া দরকার।'

'পাগল হয়েছ! রহস্যটার সমাধান না করে আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি না।'

'কিন্তু ওই ঘরে তুমি থাকবে কী করে?' রবিনের প্রশ্ন। 'চোরগুলো সতর্ক হয়েই আসবে। অন্য কেউ থাকলে দেখে ফেলবে।'

'আমাকে দেখতে পাবে না,' মুখ টিপে রহস্যময় হাসি হাসল কিশোর।

'কোথায় লুকাবে? ছদ্মবেশ পরে গেলেও তুমি ওদের কাছে অচেনা। অচেনা মানুষের সামনে গোপন আলোচনা কিছুতেই করবে না ওরা।'

'আমি ওদের কাছে অচেনা হব না।'

'মানে?'

তিনজনেই তাকিয়ে আছে কিশোরের দিকে। কিছু বুঝতে পারছে না।

'মানে অতি সহজ। এমন ছদ্মবেশ নেব, যাকে ওরা আগেও দেখেছে। সন্দেহ করবে না। ফিরেও তাকাবে না।'

'আরে বাবা খুলেই বলো না ছাই!' অধৈর্য হয়ে হাত নাড়ল মুসা।

বাইরে কেউ থাকলে শুনে ফেলতে পারে এই ভয়ে কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বলল কিশোর, 'নেপোলিয়ন সাজব আমি। ওই ভদ্রলোক আমার মতই মোটা।'

স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই। তাকিয়ে আছে কিশোরের দিকে। সাংঘাতিক এক বুদ্ধি করেছে সে। মোমের পুতুল সেজে দাঁড়িয়ে থাকবে হলঘরে। লুকানোর এমন চমৎকার বুদ্ধি আর হয় না।

সবাই প্রশংসা করতে লাগল তার।

আপাতত আর কিছু করবার নেই, মঙ্গলবার রাতের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া।

নয়

কিন্তু দিন কাটতে লাগল অত্যন্ত ধীরে। মঙ্গলবার যেন আর আসবেই না। ইতিমধ্যে বন্ধুদের নিয়ে কয়েকবার করে মোমের পুতুলগুলো দেখতে গেল কিশোর। খুঁটিয়ে দেখল নেপোলিয়নকে। ছদ্মবেশ নিতে ভুল হলে চলবে না। সামান্য একটু ভুলের জন্য সব গণ্ডগোল হয়ে যেতে পারে।

মুসা বলল, 'লম্বা চওড়া তোমারই মত। কিন্তু মুখের রঙ বদলাবে কী করে? পুতুলটার মুখ লাল, তোমার বাদামি।'

'ওটা কোন ব্যাপার না,' হাত নেড়ে বলল কিশোর। 'লাল মোম মাখিয়ে নেব মুখে। কী করে মাখাতে হয়, লেখা আছে ছদ্মবেশ নেবার একটা বইতে।'

এখানে একদিন ফগের সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল। সে-ও এসেছে পুতুল দেখতে। গোয়েন্দাদের দেখে বিরক্ত হয়ে বলল, 'ঝামেলা! যেখানেই যাই সেখানেই হাজির! তোমরা এখানে কী করছ?'

'পুতুল দেখতে এসেছি,' জবাব দিল মুসা। 'আপনি এসেছেন কেন?'

সে কথার জবাব না দিয়ে আরও বিরক্ত হয়ে হাত নেড়ে বলল ফগ, 'ঝামেলা! যাও, ভাগো!'

নদীর ধারেও গেল ওরা কয়েকবার করে। বেড়াতে নয়। বেড়াতে যাওয়ার ছুতো করে আসলে অদ্ভুত চোখওয়ালা লোকটাকে খুঁজতে। নৌকায় একবার যখন দেখা গেছে, আরও যেতে পারে। তা হলে পুলিশকে জানাতে পারবে।

অবশেষে এল অনেক প্রতীক্ষার সেই মঙ্গলবার রাত। আকাশ মেঘলা। বৃষ্টি আসতে পারে।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'সারা রাত থাকতে হতে পারে। তোমার চাচা-চাচীকে কী বলে বেরোবে?'

'ওরা নেই,' জবাব দিল কিশোর। 'তোমাদেরকে বলা হয়নি। জরুরী কাজে রকি বীচে গেছে। দু-তিন দিন আসবে না।'

'আমরা যাব তো তোমার সঙ্গে?' জানতে চাইল ফারিহা।

'না, দরকার নেই। তাতে ঝামেলা হবে। তা ছাড়া তোমাকে যেতে দেবেন না আন্টি,' মুসার আম্মার কথা বলল কিশোর।

'তোমার সঙ্গে গিয়ে হলে দাঁড়িয়ে থাকতে খুব ইচ্ছে করছে আমার,' রবিন বলল। 'দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'উপায় নেই। চোরেরা দেখে ফেলবে। তাতে আমাদের সব প্ল্যান নষ্ট হবে। তবে তুমি আর মুসা যাবে আমার সঙ্গে। কাজ আছে।'

'মাকে বলে যাওয়া যাবে না,' মুসা বলল। 'অত রাতে বেরোতে দেবে না। গোপনে যেতে হবে।'

রাতের খাওয়ার পর রওনা হলো তিন গোয়েন্দা। টিটুকে ঘরে আটকে রেখে এসেছে কিশোর। কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে রাস্তা ধরে না গিয়ে মাঠ পেরিয়ে নদীর ধারে চলে এল ওরা।

মোমের পুতুল রাখা আছে যে ঘরটায় তার কাছে এসে দেখা গেল দরজায় তালা দেওয়া, অন্ধকার। ফিসফিস করে রবিন বলল, 'ঢুকবে কী করে?'

সেদিন সকালেও পুতুলগুলো দেখতে এসেছিল ওরা। সে-কথা মনে করিয়ে দিয়ে কিশোর বলল, 'সকাল বেলা একটা জানালার ছিটকানি খুলে রেখে গেছি। সেটা দিয়ে ঢুকব।'

'আগে থেকেই এত কিছু ভেবে রাখো! কোন জানালাটা?'

জানালার কাছে দুই সহকারীকে নিয়ে এল কিশোর। পাল্লা ধরে আলতো টান দিতেই খুলে গেল। জানালা গলে ভিতরে ঢুকে পড়ল ওরা।

ঘরে আলো জ্বলছে না, তবে পুরোপুরি অন্ধকার নয়। কাছেই মেলার একটা উজ্জ্বল আলো জ্বলছে, সেই আলোর আভা এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে। অদ্ভুত দেখাচ্ছে মোমের পুতুলগুলোকে। আবছা আলোয় দিনের চেয়ে এখন বেশি জীবন্ত মনে হচ্ছে।

গায়ে কাঁটা দিল মুসার। ফিসফিসিয়ে বলল, 'দেখো, মনে হচ্ছে আমাদের

দিকেই তাকিয়ে আছে!'

'বানানোই হয়েছে ওরকম করে,' রবিন বলল। 'যেদিক থেকেই তাকাও, মনে হবে তোমার দিকে তাকিয়ে আছে।'

'চুপ! কথা বোলো না!' সাবধান করল কিশোর, 'কেউ শুনে ফেলতে পারে!'

নেপোলিয়নের গা থেকে কাপড় খোলা যতটা সহজ মনে করেছিল কিশোর, ততটা সহজ হলো না। হাত-পা নড়াতে পারে না মূর্তিটা। বেশি টানাটানি করে খুলতে গেলে ভেঙে যেতে পারে, কিংবা কাপড়গুলো নষ্ট হতে পারে এই ভয়ে আস্তে করতে হচ্ছে। মুসা আর রবিন সাহায্য না করলে একা কিছুতেই কাজটা করতে পারত না সে।

কাপড়গুলো খুলে নিয়ে মূর্তিটা একটা আলমারিতে ঢুকিয়ে রেখে এল ওরা।

দ্রুত পোশাকগুলো পরে ফেলল কিশোর। বাড়ি থেকেই মুখে রঙ মাখিয়ে এসেছে। মূর্তিটা যেখানে ছিল সেখানে গিয়ে দাঁড়াল।

'দারুণ হয়েছে!' মুসা বলল। 'একেবারে নেপোলিয়নের মূর্তি! কিন্তু একভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে কি করে? না নড়ে পারবে?'

'পারব,' দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল কিশোর। 'শোবার ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার প্র্যাকটিস করেছি।'

খুট করে শব্দ হলো দরজায়। ফিরে তাকাল ওরা। নিশ্চয় কেউ আসছে।

'জলদি বেরোও!' কিশোর বলল। 'পাল্লাটা ঠেলে দিয়ে যাবে! সোজা বাড়ি চলে যাও। তোমাদের আর থাকার দরকার নেই। সকালে দেখা হবে।'

নিঃশব্দে জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল দুই গোয়েন্দা। পাল্লা লাগিয়ে দিল মুসা।

দরজার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। কে আসছে? এত তাড়াতাড়িই চলে এল চোরেরা?

খুলে গেল দরজা। একটা ছায়ামূর্তি ঢুকল। আবার লাগিয়ে দিল দরজা। হালকা পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল কিশোরের দিকে।

স্তব্ধ হয়ে গেল কিশোর। এই লোককে এখানে আশা করেনি। কনস্টেবল ফগর্যাম্পারকট!

এই লোক এখানে ঢুকেছে কেন?

খানিক পরেই বুঝতে পারল কিশোর। তার পেছনে একটা মূর্তি আছে, পুলিশের মূর্তি। আকারে, উচ্চতায় প্রায় ফগেরই সমান। পরনে ইউনিফর্ম। সেটাকে একধারে একটা মোটা পর্দার আড়ালে রেখে এসে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল সে।

চকিতে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল কিশোরের কাছে। ফগকে যতটা বোকা সে ভেবেছিল, ততটা তো নয়ই, বরং যথেষ্ট চালাক এই লোক। অদৃশ্য কালিতে লেখা মেসেজ পড়ে ফেলেছে সে। কিশোরের মতই পুতুল সেজে হলঘরে দাঁড়িয়ে

থাকবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার জন্যে একটা সুবিধে হয়েছে, পুতুলের গা থেকে ইউনিফর্ম পরার প্রয়োজন পড়েনি। ইউনিফর্ম পরে এসেছে, জায়গামত দাঁড়িয়ে গেছে কেবল। নিশ্চয় নকল চাবি বানিয়ে নিয়েছে, সেটা দিয়ে দরজার তালা খুলে ঢুকেছে।

পাথরের মত স্থির হয়ে আছে কিশোর। তার ঠিক পেছনেই রয়েছে ফগ। সামান্যতম নড়াচড়া করলেও এখন ধরা পড়ে যাবে।

ঠাণ্ডা লেগেছে ফগের। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে। এ রকম হতে থাকলে চোরগুলোর কানে চলে যাবে। তবে এটা কমে যেতে পারে। পরিশ্রমের জন্য হয়তো বেশি ভারি হচ্ছে নিঃশ্বাস। যে ভারির ভারি একেকটা মূর্তি। একা যে সরিয়ে রেখে এসেছে এই বেশি।

সত্যি কমে গেল নিঃশ্বাসের শব্দ। তবে বার বার নাক টানছে ফগ। হাঁচি ঠেকানোর চেষ্টা করছে। পারল না। হ্যাঁচচো করে উঠল। বিড়বিড় করে কিছু বলল, বোধহয় সর্দিকেই গাল দিল। কাশল কয়েকবার। রুমাল দিয়ে নাক মুছল।

সেরেছে! ভাবল কিশোর, সব ভেস্তে দিয়ে ছাড়বে আজ এই লোকটা! চোরেরা এলে যদি এ রকম করতে থাকে···

বাইরে কথা শোনা গেল। মুহূর্তে নীরব হয়ে গেল ফগ। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল চারজন লোক। হ্যাট টেনে দিয়েছে কপালের উপর। চেহারা চেনা যাচ্ছে না। চেয়ার টেনে বসল। বাতি কিংবা টর্চ কিছুই জ্বালল না।

চুপ করে আছে সবাই। কথা বলছে না। যেন কারও অপেক্ষা করছে।

অবশেষে অধৈর্য হয়ে একজন বলল, 'মোমের পুতুল আসছে না কেন?'

'চলে আসবে,' বলল আরেকজন। 'বুড়ো জনসনের কাছে মেসেজ দিয়ে রেখেছি। পেয়ে যাবে।'

আবার অপেক্ষার পালা।

হাতঘড়ি দেখল একজন। 'আর কত দেরি করব? রাত শেষ হয়ে গেলে আর সারব কখন আজ?'

'আজ রাতে কাজ আছে?' জানতে চাইল আরেকজন। 'কোথায়? সবাইকে যেতে হবে?'

'হ্যাঁ, সবাইকে। ফিল্ম স্টার নিপা ম্যারিয়নের মুক্তোর হারটা নেয়ার কথা আজ।'

'তাই? অনেক দামী জিনিস তো।'

'তা তো বটেই। কিন্তু মোমের পুতুলই তো আসছে না! তারও যাবার কথা! গোলমাল করে দেবে দেখছি সব! শোনো, লোহার পুতুল, তুমি চালাবে গাড়ি···'

ডাকাতির প্ল্যান বলতে লাগল লোকটা।

দম বন্ধ করে শুনছে কিশোর আর ফগ।

কিশোর ভাবছে, আর বেশিক্ষণ থাকবে না এখানে লোকগুলো। মোমের পুতুল না এলেও ওদের কাজ করতে চলে যাবে। তখন কী করবে সে? ক্যাপ্টেন রবার্টসনকে ফোন করে ডাকাতদের পরিকল্পনার কথা জানাবে? ফগ এখানে না থাকলে তা-ই করত, কিন্তু ফগ···

ঠিক এই সময় সর্বনাশ করে দিল ফগর‍্যাম্পারকট। ভীষণ হাঁচি পেল তার। সেটাকে ঠেকাতে গিয়ে নাক-মুখ দিয়ে খোঁৎ-খোঁৎ জাতীয় বিচিত্র একটা শব্দ করে ফেলল।

দশ

বেশি জোরে হয়নি শব্দটা। তবে এই নীরবতার মাঝে যথেষ্ট। চমকে গেল লোকগুলো। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। তাকাতে লাগল চারপাশে। চিৎকার করে বলতে লাগল, 'কে করল? কেউ আছে এখানে! চোখ রাখছে আমাদের ওপর!'

হ্যাটের নিচে চকচক করছে লোকগুলোর চোখ। ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। একজন বের করল পিস্তল, আরেকজন ছুরি। টর্চের আলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠল ছুরির ঝকঝকে ফলা। ভয় পেয়ে গেল কিশোর। ঝামেলা পাকানোর ওস্তাদ ওই গর্দভ ফগটা দিল সব নষ্ট করে! এখন প্রাণটা খোয়াতে না হলেই বাঁচে!

'কেউ আছে এখানে!' চিৎকার করে উঠল এক চোর। 'কে? জলদি বেরিয়ে এসো!'

নড়লও না কিশোর কিংবা ফগ।

'জায়গাটাই জানি কেমন!' আরেক চোর বলল। 'দেখো, কেমন জুলজুল করে তাকিয়ে আছে মূর্তিগুলো! ভূতুড়ে!'

'আরি ধূর! ওগুলো তো পুতুল। ভূতফূতেও বিশ্বাস করি না আমি!' বলল প্রথমজন। 'নিশ্চয় কোন মানুষ লুকিয়ে আছে এগুলোর মধ্যে! দেখা দরকার!'

টর্চ বের করল লোকটা। একধার থেকে আলো ফেলে ফেলে দেখতে শুরু করল মূর্তিগুলো।

স্থির চোখে তাকিয়ে রইল প্রথম মূর্তিটা। ভাল করে দেখে বলল লোকটা, 'ঠিকই আছে। এটা পুতুলই।'

তার পরেরটা দেখল। এ ভাবে দেখতে দেখতে এগিয়ে আসতে লাগল।

ঘামতে শুরু করেছে কিশোর। তার সামনে এসে দাঁড়াল লোকটা। টর্চের আলো ফেলল চোখে।

তীব্র আলো সইতে পারল না চোখ। আপনাআপনি বুজে গেল পাতা।

চিৎকার করে উঠল লোকটা, 'পেয়েছি!'

খপ করে হাত চেপে ধরে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে নিল কিশোরকে।

তার মুখে আলো ধরে রেখে কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করল লোকটা, 'কে তুমি?'

'নেপোলিয়ন!' ভয় পেয়েছে যে সেটা বুঝতে দিতে চাইল না কিশোর। 'মূর্তি সেজে মজা করছিলাম! আপনারা যে ঢুকবেন বুঝতে পারিনি।'

কিশোরের মাথা থেকে নেপোলিয়নের হ্যাটটা খুলে নিল আরেকজন। চিৎকার করে বলল, 'আরি, এ তো একটা ছেলে!'

প্রথম লোকটা বলল, 'একে নিয়ে এখন কী করি? গাড়িতে তোলা যাবে না। বিপদে ফেলে দিতে পারে। কেন এসেছে, পিটুনি দিলেই বলে দেবে। তবে এখন সময় নেই। পরে জিজ্ঞেস করব।'

'বেঁধে এখানে ওই আলমারিটাতে ফেলে রেখে গেলেই হয়,' পরামর্শ দিল একজন।

'তা হয়।'

কিশোরের হাত-পা বাঁধল চোরেরা। মুখে রুমাল গুঁজল। তারপর নিয়ে গিয়ে ঢোকাল আলমারিতে। নেপোলিয়নের মূর্তিটার পাশে রেখে, দরজা বন্ধ করে হুড়কো তুলে দিল।

খুব একটা ঘাবড়াল না কিশোর। জানে, ফগ আছে ঘরে। সব দেখেছে। লোকগুলো চলে গেলেই তাকে আলমারি থেকে বের করবে।

কিছুই শুনতে পাচ্ছে না এখানে সে। লোকগুলো কখন বেরোল, দরজা বন্ধ করল, কিচ্ছু জানতে পারল না।

লোকগুলো বেরিয়ে গেলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ফগ। হাঁচিটা দিয়ে ফেলবার পর থেকেই আফসোস করছিল। বুঝতে পেরেছিল, পুতুলের মধ্যে খুঁজে দেখবে লোকগুলো। ধরা পড়বার অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু ওর মধ্যে থেকে কিশোর পাশা বেরিয়ে পড়বে, কল্পনাও করতে পারেনি। আরেকটু হলেই মুখ ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, 'ঝামেলা!' তা হলে সে-ও ধরা পড়ত। সময় মত সামলে নিতে পেরেছে বলে রক্ষা।

কিশোর ধরা পড়াতেই নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে চোরেরা। আরও যে কেউ থাকতে পারে, ভাবেনি। তা হলে আরও খুঁজত। ম্যারিয়ন হাউসে যাবে ওরা হার চুরি করতে। ধরতে হলে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করতে হবে।

কিশোরকে আলমারিতে ভরতে দেখে মনে মনে হেসেছে ফগ। খুব খুশি। আচ্ছা শিক্ষা হয়েছে বেয়াদবটার। বের করে রেখে যাবে নাকি? না, থাক্, আলমারিতেই আটকে থাকুক। শাস্তি হোক। এখন ছাড়াটাও বিপজ্জনক। চোরগুলোর প্ল্যান শুনেছে। ছাড়া পেলে আবার গিয়ে কোন শয়তানি করবে কে জানে! কিন্তু আটকা থেকে দম বন্ধ হয়ে মরবে না তো? দেখা দরকার। তেমন

খারাপ অবস্থা দেখলে খুলে দিয়েই যেতে হবে।

আলমারির দরজা খুলল সে। টর্চের আলোয় দেখল, নেপোলিয়নের সঙ্গে বহাল তবিয়তেই আছে কিশোর। মুচকি হেসে বলল ফগ, 'থাকো এখানে। ঘুমাও। আমি কাজ সেরে আসি, চোরগুলোকে ধরি, তারপর এসে খুলব তোমাকে। ততক্ষণের জন্যে গুড বাই।'

আবার দরজা লাগিয়ে দিল সে।

এমন একটা কাণ্ড করবে ফগ, ভাবেনি কিশোর। দড়ি খুলবার জন্য টানাটানি শুরু করল সে। বাঁধা থাকলে কী ভাবে খুলতে হয়, বইয়ে পড়েছে। যতগুলো কৌশল দেওয়া আছে, একে একে সব চেষ্টা করে দেখল। কাজ হলো না। কেবল মুখের রুমালটা খুলতে পারল।

বদ্ধ আলমারিতে বেজায় গরম। তার উপর এই পরিশ্রমে দম বন্ধ হয়ে এল তার। হাঁসফাঁস করতে লাগল। ফগ কখন আসবে কোন ঠিকঠিকানা নেই। চোর ধরতে ধরতে সকালও হয়ে যেতে পারে। ততক্ষণ টিকবে তো এখানে? ইস্, রবিন আর মুসাকে বাড়ি চলে যেতে বলা ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু সে কী আর জানত, ঝামেলা-র‍্যাম্পারকটটাও এসে ঢুকবে! সব ভণ্ডুল করে দেবে!

একটা শব্দ হলো। কে যেন এসে দাঁড়াল আলমারির বাইরে। হুড়কো খুলবার শব্দ। খুলে গেল দরজা।

টর্চের আলো পড়ল কিশোরের মুখে।

উত্তেজিত স্বরে রবিন বলল, 'বলেছি না, ওকে এখানেই আটকেছে!'

'জলদি খোলো!' কিশোর বলল। 'মরে গেলাম!'

বাঁধন খুলতে দেরি হলো না। আলমারি থেকে বেরোতে কিশোরকে সাহায্য করল মুসা আর রবিন।

হাত-পা ডলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করতে করতে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'তোমরা এলে কী করে? বাড়ি যাওনি?'

'না,' জবাব দিল মুসা। 'জানালা দিয়ে তখন বেরিয়েই মনে হলো, একা তুমি মজা পাবে, আর আমরা বোকা হয়ে ঘরে বসে থাকব, তা হয় না। তাই হলের কাছ থেকে দূরে একটা ঝোপে লুকিয়ে বসে থাকলাম। লোকগুলোকে ঢুকতে দেখেছি আমরা। পা টিপে টিপে এসে কান পেতে ছিলাম জানালায়। ওদের সব কথা শুনতে পাইনি। তবে কিছু একটা যে গণ্ডগোল হয়েছে, তুমি ধরা পড়েছ, এটা বুঝেছি। তারপর দেখলাম, ওরা বেরিয়ে গেল। তুমি নেই সঙ্গে। তারপর বেরোল ফগটা। বুঝলাম, ভেতরেই আছ তুমি।'

'যাক, বাড়ি না গিয়ে ভালই করেছ। অনেক ধন্যবাদ। ফগটা যখন আমাকে রেখে চলে গেল, আফসোস হচ্ছিল, কেন তোমাদের যেতে বললাম।'

'যাক, ধন্যবাদটা যে তা-ও দিলে!' হেসে বলল মুসা।

'তা কি কি শুনলে?' জানতে চাইল রবিন। 'কি বলল ওরা?'

সব খুলে বলল কিশোর।

মুসা বলল, 'ক্যাপ্টেনকে তা হলে ফোন করা দরকার। এখুনি।'

'না, দরকার নেই। ফগ সব শুনেছে। যা করার সে-ই করবে। আমাদের আর কিছু করার নেই। বরং ওকে একটা শিক্ষা দেব। আমাকে ফেলে রেখে গেছে, এ-জন্যে ভোগাতে হবে ওকে।'

'কী করে?'

'ও এসে দেখবে আমি নেই এখানে। আমাকে যে বের করেছ, জানাব না। সকালে তোমরা গিয়ে ওকে বলবে, আমাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ভয়ানক ঘাবড়ে যাবে। ক্যাপ্টেনের কানে যাবে এই কথা। দায়িত্বে গাফিলতির জন্যে বকা খেতে হবে ওকে। বলা যায় না, শাস্তিও হয়ে যেতে পারে।'

'ঠিক!' একমত হলো রবিন।

মুসা হাসল। 'তুমি যাবে কোথায়?'

'কোথায় আবার, বাড়িতে। চাচা-চাচী তো নেইই। আরামসে লুকিয়ে থাকতে পারব। ফগ খুঁজেও পাবে না।'

এগারো

ফগ ওদিকে খুব ব্যস্ত। লোক নিয়ে এসে নিপা ম্যারিয়নের বাড়ি ঘেরাও করে ফেলল। চোরগুলো তখন ভিতরে। চারজনকেই ধরা হলো, কিন্তু ধস্তাধস্তি করে ফসকে বেরিয়ে গিয়ে একজন পালাল। বাকি তিনজনকে নিয়ে যাওয়া হলো হাজতে।

রাত দুটোয় কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরবে ফগ, এই সময় মনে পড়ল হলঘরের আলমারিতে আটকে রয়েছে কিশোর পাশা।

'ঝামেলা!' বিড়বিড় করতে লাগল সে। 'এই রাত দুপুরে কোথায় গিয়ে একটু বিছানায় গা লাগাব, তা না, বিচ্ছুটাকে খুলতে যাও! সারারাত ওখানে থাকলেই ভাল হত। শিক্ষা হত ছোঁড়াটার। কিন্তু সেটা করা যাবে না। ক্যাপ্টেন শুনলে ভীষণ রেগে যাবেন। তবে এইবার আর রহস্য সমাধানের বাহাদুরিটা নিতে পারবে না ও। আমিই নেব।'

সাইকেল ঘুরিয়ে রওনা হলো ফগ। হলের কাছে এসে বাইরে সাইকেল রেখে ভিতরে ঢুকল। টর্চ জ্বেলে এগিয়ে গেল আলমারির কাছে। দরজায় টোকা দিয়ে বলল, 'কী মিয়া, কেমন আছ? বেরোতে চাও-টাও? মজাটা কিন্তু শেষ। তোমার

জন্যে কিচ্ছু বাকি রইল না। হাহ্ হাহ্!'

জবাব এল না।

আরও জোরে টোকা দিল ফগ। ভাবল ঘুমিয়ে পড়েছে কিশোর।

এবারও সাড়া না পেয়ে থাবা দিল। তারপরও যখন সাড়া পেল না, ঘাবড়ে গেল ফগ। বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হলো। মরে গেল না তো ছেলেটা?

তালায় চাবি লাগানোই আছে। তাড়াতাড়ি পাল্লা খুলে ফেলল ফগ। হাঁ হয়ে গেল। বিড়বিড় করে কেবল বলল, 'ঝামেলা!'

কিশোর নেই। নিষ্প্রাণ চোখে কেবল তাকিয়ে আছে ন্যাংটো নেপোলিয়ন। ফগের হাত কাঁপছে। গেল কোথায় ছেলেটা? তালা দেওয়া ঘর থেকে উধাও হয়ে যাওয়ার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে ছেলেটার। নিজের বাড়িতে চিলেকোঠায় তালা দিয়ে রেখেছিল একবার ফগ নিজের হাতে, কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে দেখে তালা ঠিকই দেওয়া রয়েছে, কিন্তু কিশোর গায়েব। রহস্যটার সমাধান কোনদিনই করতে পারেনি সে। এবারেও ঠিক একই ঘটনা ঘটল। একেবারে ম্যাজিক।

একগাদা দুশ্চিন্তা নিয়ে বাড়ি ফিরে চলল ফগ। হলো কী কিশোরের? চোরের দলে আরও লোক আছে, সব ধরা পড়েনি। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ওদের কেউ এসে ছেলেটাকে ধরে নিয়ে যায়নি তো? আটকে রেখে পরে হয়তো মুক্তিপণ দাবি করবে। কী জবাব দেবে এখন ক্যাপ্টেনের কাছে? সকাল দশটায় তাঁর সঙ্গে দেখা করবার কথা।

বাড়ি ফিরে সারারাত আরামে ঘুমাল কিশোর, আর ফগের ঘুমই হলো না। ভোররাতের দিকে একটু তন্দ্রামত এসেছিল, দুঃস্বপ্ন দেখল–কিশোরকে খুন করে ফেলেছে ডাকাতেরা। সব দোষ ফগের উপর চাপিয়েছেন ক্যাপ্টেন রবার্টসন। চাকরি তো খেয়েছেনই, তাকে জেলে ভরে দিয়েছেন তিনি।

জেগে উঠে ফগ দেখল, ঘামে ভিজে গেছে বিছানা। উঠে পড়ল সে।

সকাল ন'টায় এসে হাজির হলো কিশোরের সহকারীর দল। বাড়ি ঘেরাও করল ফগের। বাইরে থেকে চেঁচামেচি শুরু করল।

বেরিয়ে এল পুলিশম্যান। এত হই-চই কীসের জানতে চাইল।

কাঁদো কাঁদো গলায় মুসা বলল, 'কাল রাত থেকে কিশোরের কোন খবর নেই। তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

কিশোর হয়তো বাড়ি ফিরে গেছে এ ব্যাপারে ক্ষীণ একটা আশা যা-ও বা ছিল ফগের, একেবারে দূর হয়ে গেল। নিশ্চিত হয়ে গেল, ডাকাতেরাই ধরে নিয়ে গেছে ওকে। বুঝল, কপালে খারাবি আছে তার। ক্যাপ্টেন তাকে ছাড়বেন না। উফ, কেন যে বোকামিটা করল! আলমারি থেকে কিশোরকে বের করে দিয়ে তারপর চোর ধরতে গেল না যে কেন!

সময় পার হয়ে যাচ্ছে। বসে বসে ভাবলে চলবে না। দশটার সময়

ক্যাপ্টেনের কাছে যেতে হবে। তিনি অপেক্ষা করবেন।

জরুরি কাজে বাইরে যাচ্ছে, ফিরে এসে কিশোরকে খুঁজতে বেরোবে–ছেলেমেয়েদের এই ভরসা দিয়ে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ফগ।

তার জন্যই অপেক্ষা করছেন ক্যাপ্টেন। বললেন, 'ভাল কাজ দেখিয়েছ, ফগর‍্যাম্পারকট। কিন্তু একটা ভুল করে ফেলেছ।'

চমকে গেল ফগ। ভাবল, কিশোরের কথা বলছেন তিনি। ছেলেমেয়েগুলো নিশ্চয় ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে তাঁকে।

গোল গোল চোখ আরও গোল হয়ে গেল ফগের। 'কী ভুল, স্যার?'

'রিপোর্টে লিখেছ, বমাল পাকড়াও করেছ চোরগুলোকে। তা করেছ। তবে মাল, অর্থাৎ মুক্তাগুলো আসল নয়, নকল। যে হারটাতে বসানো আছে সেটাও খুব সস্তা জিনিস।'

ফগের জন্য আরেকটা দুঃসংবাদ। বলল, 'নকল! কিন্তু, স্যার, চোরের পকেটেই তো পাওয়া গেছে ওটা। ঝামেলা!'

'তা গেছে, তবে সেটা নকল। তার বান্ধবীকে উপহার দেয়ার জন্যে কিনেছিল। আসল হারটা গায়েব।'

মরা মাছের মত হাঁ হয়ে গেল ফগের মুখ। 'ঝামেলা! তা কী করে সম্ভব!'

'সম্ভব,' মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন। 'আমার ধারণা, ঘরে ঢুকেছিল তিনজন, বাইরে দাঁড়ানো ছিল একজন। ওপরতলায় থেকে তিন চোর যেই বুঝল, পুলিশ এসেছে, নীচে বাইরে দাঁড়ানো তার সঙ্গীর কাছে আসল হারটা ছুঁড়ে দিল জানালা দিয়ে। সেই লোকটাই তোমাদের হাত ফসকে পালিয়েছে। হারটাও নিয়ে গেছে সঙ্গে করে।'

'তারমানে কোন লাভই হলো না, স্যার!'

'একেবারে হয়নি, বলা যাবে না। তিনজনকে তো ধরেছ। বাকিগুলোও আর বেশি দিন পালিয়ে থাকতে পারবে না। ধরা পড়বে।' একটা মুহূর্ত ফগের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন ক্যাপ্টেন। 'তোমার রিপোর্টটা খুব সংক্ষিপ্ত। সব কথা লেখার সময় পাওনি মনে হয়। মোমের পুতুলের হলঘরে যা যা ঘটেছে সব খুলে বলো তো।'

ইউনিফর্ম ইস্ত্রি করে, বোতাম আর বুট চকচকে পালিশ করে ধোপদুরস্ত হয়ে এসেছে ফগ। তার ধারণা, প্রমোশন এবার আর কেউ আটকাতে পারবে না। টেনেটুনে বেল্ট এঁটে নিয়ে গর্বের সঙ্গে চোর ধরবার কাহিনী বলতে শুরু করল সে।

ফগ হাঁচি দেওয়ার পর কিশোর পাশাকে ধরে ফেলেছে চোরগুলো, এ জায়গায় এসে পিঠ খাড়া হয়ে গেল ক্যাপ্টেনের। 'কিশোর পাশা? সে-ও পুতুল সেজেছিল?'

'হ্যাঁ, স্যার, নেপোলিয়ন। তার সেই চিরকেলে নাক গলানো স্বভাব। যাই হোক, আমাকে ধরতে পারেনি ওরা। বেরিয়ে এলাম। সোজা ছুটে গেলাম ফোন

করতে…'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, এক মিনিট। কিশোর পাশার কী হলো?'

'তেমন কিছু না, স্যার,' অহেতুক একটা বোতামে হাত বোলাল ফগ, যেন ডলে পরিষ্কার করার চেষ্টা করছে। 'ওকে বেঁধে একটা আলমারিতে ভরে রাখল। মারধর করেনি। করলে ছাড়তাম না, আটকাতাম।'

'নিশ্চয় তার বাঁধন খুলে দিয়েই চোর ধরতে বেরিয়েছ?'

লাল মুখ আরও লাল হয়ে গেল ফগের। 'ইয়ে, স্যার, সত্যি বলতে কী, স্যার, সময়ই পাইনি। চোর ধরার তাড়া ছিল তখন। ভাবলাম, ওদেরকে ধরে এনে তারপর মুক্ত করব। তা ছাড়া ওকে খুলে দিলে আরও একটা ভয় ছিল, ঠিক গিয়ে হাজির হবে ম্যারিয়ন ম্যানশনে, বিপদে জড়াবে। তাই…'

'ফগ!' কঠোর হয়ে গেল ক্যাপ্টেনের দৃষ্টি। 'কাজটা তুমি ঠিক করোনি! একটা ছেলেকে ওভাবে আলমারিতে ফেলে চলে যাওয়াটা মোটেও উচিত হয়নি তোমার! তারপর, বের করলে কখন?'

ঢোক গিলল ফগ। 'কাজ সেরে রাত দুটোর সময় খুলতে গিয়েছিলাম, স্যার। দেখি সে আলমারিতে নেই।'

'বলো কী!' ভুরু কুঁচকে গেল ক্যাপ্টেনের। 'কি হয়েছে তার জেনেছ?'

'না, স্যার!' নীচের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল ফগ।

ডেস্কে রাখা পাঁচটা টেলিফোনের একটার দিকে হাত বাড়ালেন ক্যাপ্টেন। 'বাড়িতে করে দেখি আগে…'

আরও লাল হয়ে গেল ফগের গাল। 'বাড়িতে করে লাভ নেই, স্যার। ও বাড়ি যায়নি। তার বন্ধুরা সকালে এসে জানিয়ে গেছে আমাকে, ওকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'পাওয়া যাচ্ছে না! আর এই জরুরী খবরটা এতক্ষণে বলছ আমাকে! জলদি যাও, ওকে খোঁজোগে! আমি দেখি কী করতে পারি।'

আষাঢ়ের মেঘে ঢাকা আকাশের মত মুখ করে ক্যাপ্টেন রবার্টসনের অফিস থেকে বেরিয়ে এল ফগ। সাইকেলে করে গ্রীনহিলসে ফিরে চলল। মনে দারুণ দুশ্চিন্তা। কোথায় গেল ছোঁড়াটা? কী হলো? খারাপ কিছু ঘটে গেলে তার নিজের কপালেও দুঃখ আছে। ক্যাপ্টেন তাকে ছাড়বেন না।

গাঁয়ের ভিতর ঢুকে এতটাই ক্লান্ত লাগতে লাগল, সাইকেল চালাতেও কষ্ট হলো ফগের। একটা গাছের নীচে সাইকেল রেখে গোড়ায় বসে পড়ল ঠেস দিয়ে। চোখ বন্ধ করে ভাবতে লাগল। কোথায় আছে কিশোর পাশা? কী করে জানবে?

ছোট্ট একটা কুকুর এগিয়ে এল। শুঁকতে লাগল সাইকেলটা। তারপর এসে দাঁড়াল ফগের পায়ের কাছে। খেঁক খেঁক করে হালকা ডাক ছাড়ল দু'বার।

চোখ মেলল ফগ। 'ঝামেলা! যা ভাগ!' বলেই বড় বড় হয়ে গেল চোখ

টিটুকে চিনতে পেরেছে।

চোখের কোণ দিয়ে নড়াচড়া লক্ষ করে সেদিকে ফিরতেই কোটর থেকে চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসবার অবস্থা হলো। বিশ্বাস করতে পারছে না। ওই তো দাঁড়িয়ে আছে জলজ্যান্ত কিশোর পাশা। তার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

'কোথায় ছিলে তুমি?' জানতে চাইল ফগ। কোলা ব্যাঙের স্বর বেরোল গলা দিয়ে।

'বাড়িতে। কেন?'

'বাড়িতে? মানে, তোমাদের বাড়িতে? তবে যে তোমার বন্ধুরা এসে বলে গেল তোমাকে পাওয়া যাচ্ছে না?'

'কী জানি ওরা কি জেনেছে।'

উঠে দাঁড়াল ফগ। 'আলমারি থেকে বেরোলে কী করে?'

'সেটা আপনাকে বলব না। চলি, কাজ আছে।'

'কোথায় যাচ্ছ তুমি এখন?'

'বাড়িতে। কেন, কোন দরকার আছে?'

নীরবে মাথা নাড়ল শুধু ফগ। আবার সাইকেলে চাপল। ক্যাপ্টেনকে ফোন করতে যেতে হবে।

কিশোর ফিরে এসেছে শুনে ক্যাপ্টেন জানতে চাইলেন, 'রাতে কোথায় ছিল ও?'

'বা-ব্বাড়িতে, স্যার,' তোতলাতে লাগল ফগ। 'ওর বন্ধুরা এসে আমাকে বলল পাওয়া যাচ্ছে না...'

'আর অমনি তুমিও ধরে নিলে সে নেই! একবার গিয়ে খোঁজ করে দেখারও প্রয়োজন বোধ করলে না! গাধা কোথাকার!'

রাগ করে যে লাইন কেটে দিয়েছেন ক্যাপ্টেন, বুঝতে অসুবিধে হলো না ফগের। বিমর্ষ বদনে বাড়ি ফিরে চলল সে।

বাড়ি ফিরে ক্যাপ্টেন রবার্টসনের ফোন পেল কিশোর। তাকে যেতে অনুরোধ করলেন তিনি। জরুরি।

খবরটা ফোনে মুসাকে জানাল কিশোর। সবাইকে ছাউনিতে অপেক্ষা করতে বলল। টিটুকে সাইকেলের বাস্কেটে তুলে নিয়ে তখুনি রওনা হলো ক্যাপ্টেনের অফিসে। এত জরুরী তলব কেন? ফগকে ধোঁকা দিয়েছে বলে তিনি কি রাগ করলেন? নাকি নির্দেশ অমান্য করে চোরের পেছনে লেগেছিল বলে তাকে বকা দেওয়ার জন্য ডেকে নিয়ে যাচ্ছেন?

বারো

কিন্তু রাগ করেননি ক্যাপ্টেন। হাসিমুখে আছেন। বসতে বললেন কিশোরকে। পুরো ঘটনা খুলে বলতে অনুরোধ করলেন।

বলল কিশোর। কিছুই বাদ দিল না। তার বিভিন্ন ছদ্মবেশ নেওয়ার কাহিনী শুনে খুব মজা পেলেন ক্যাপ্টেন। বুদ্ধির তারিফ করলেন। শেষে বললেন, 'কেন ডেকেছি তোমাকে, সেই কথা বলি। চোরের পকেটে পাওয়া হারটা নকল। আসল হারটা খোয়া গেছে। এখনও পাওয়া যায়নি।'

'তাই নাকি?' আগ্রহে সামনে ঝুঁকে বসল কিশোর। খুশিও হলো মনে মনে। রহস্যটার এখনও সমাধান হয়নি ভেবে।

কী ভাবে খোয়া গেছে আসল হারটা, নিয়ে পালিয়েছে একটা চোর, বললেন ক্যাপ্টেন।

'ওই চোরটাকে ধরতে পারলেই তো হয়ে যায়,' কিশোর বলল।

গম্ভীর হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। 'সে-ও ধরা পড়েছে, কিছুক্ষণ আগে। তার কাছে নেই হারটা। কোথায় রেখেছে বলছে না। চোরগুলোর কাছে একটা কথা জানা গেছে, ওদের সর্দারের ছদ্মনাম মোমের পুতুল। চোরাই মাল সব তার কাছে জমা দিয়ে দেয়া হয়, সে-ই বিক্রি করে। টাকাপয়সা ভাগ করে দেয়। মুক্তার হারটা নিয়ে গিয়ে কোথাও রেখে দিয়েছে চোরটা। পরিস্থিতি শান্ত হলে ওখান থেকে বের করে নিয়ে যাবে ওটা ওদের সর্দার মোমের পুতুল।'

'এই লোকটা কে, জানেন না নিশ্চয়?'

'না, জানি না। চোরের পিছু নেয়াটা বিপজ্জনক ছিল, তাই ও কাজ করতে মানা করেছিলাম তোমাদের। কিন্তু লুকানো হার বের করার মধ্যে কোন বিপদ দেখতে পাচ্ছি না। ইচ্ছে হলে চেষ্টা করে দেখতে পারো।'

তারমানে এই রহস্য সমাধানের ঢালাও অনুমতি দিয়ে দেয়া হলো। খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল কিশোরের। উত্তেজিত হয়ে বলল, 'নিশ্চয় করব, স্যার! ওই হার আমরা বের করেই ছাড়ব!'

ক্যাপ্টেনের অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা মুসাদের বাড়ি চলে এল কিশোর। ছাউনির হেডকোয়ার্টারে পাওয়া গেল তিনজনকে। উদ্বিগ্ন হয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছে। ক্যাপ্টেন কেন ডেকেছেন, সে-কথা জানতে চাইল।

সব খুলে বলল কিশোর।

খবর শুনে পিঠ সোজা হয়ে গেছে সবার। রবিন বলল, 'কী বলছ!'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। রহস্যটার পুরো সমাধান হয়নি এখনও। হারটা খুঁজে বের করার অনুরোধ করেছেন আমাদের ক্যাপ্টেন। তাঁর ধারণা, কাল রাতে হারটা নিয়ে পালিয়ে গিয়ে কোন নিরাপদ স্থানে ওটা লুকিয়ে ফেলেছে এক চোর। আজ সকালে ধরা পড়েছে সে। হারটা তখন তার কাছে ছিল না। ওটা এখন খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।'

'কী করে?' রবিন বলল, 'কোথায় খুঁজতে হবে সেটাই যদি না জানি, কোথায় যাব খুঁজতে? এটা অসম্ভব।'

'ভালো গোয়েন্দার অভিধানে অসম্ভব বলে কোন কথা নেই,' কিশোর বলল। 'তবে কাজটা খুব কঠিন এ কথা বলতে পারো। মোমের পুতুলকে খুঁজে বের করতে পারলে তার পিছু নিয়ে হারটার কাছে চলে যেতে পারব। কোন না কোন সময় ওটা বের করে নেয়ার চেষ্টা সে করবেই।'

'কিন্তু কে এই মোমের পুতুল?' মুসার প্রশ্ন। 'তাকেই বা খুঁজে বের করব কী করে আমরা!'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরব হয়ে রইল সবাই। উত্তরটা কারও জানা নেই।

অবশেষে কিশোর বলল, 'ভেবে দেখা যাক, মোমের পুতুল সম্পর্কে আমরা কী কী জানি? সে একটা সাইকেল চালায়, যাতে হর্ন লাগানো আছে। তার চোখ দুটো অদ্ভুত—একটা বাদামী, আরেকটা নীল। তার একটা নৌকা আছে, কিংবা কারও কাছ থেকে নিয়ে চালিয়েছে। দুই দুইবার গ্রীনহিলসে দেখা গেছে তাকে, সুতরাং ধরে নেয়া যায় সে এখানেই বাস করে।'

আবার নীরবতা। এ সব তথ্য দিয়ে কী উপকারটা হবে বুঝতে পারছে না কেউ।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'আমি জানি, কি করতে হবে!'

'কী?' সবাই একযোগে তাকাল তার দিকে।

'হারটা যে চোর নিয়েছিল, সে জানত পুলিশের হাতে ধরা তাকে পড়তেই হবে, পালিয়ে বাঁচতে পারবে না। তাই লুকানোর পর নিশ্চয় একটা মেসেজ দিয়েছে মোমের পুতুলকে। মেসেজটা কাকে দিয়ে পাচার করবে বলো তো?'

'অবশ্যই বুড়ো জনসন!' তুড়ি বাজাল কিশোর, 'পেয়েছি! ছেড়ে দিয়েছে ওকে ফগ। মেসেজ দেয়ার জন্যে ওকেই সব সময় ব্যবহার করত চোরেরা, আরও একবার করলে কোনো দোষ নেই...'

'বুড়োর পাশে গিয়ে বসে পড়বে মোমের পুতুল, মেসেজটা নিয়ে নেবে! তারপর যাবে হারটা বের করতে! আমরা তখন পিছু নেব তার!' রবিন বলল।

কিশোর বলল, 'একসঙ্গে সবার যাওয়াটা ঠিক হবে না। তাতে সতর্ক হয়ে যেতে পারে মোমের পুতুল। আমি যাব পিছে পিছে। তোমরা দূর থেকে আমাকে অনুসরণ করবে।'

'সাইকেল নেয়া উচিত,' মুসা বলল। 'ওই লোকটা সাইকেলে করে আসে। হেঁটে তার সঙ্গে পারা যাবে না।'

'হ্যাঁ, ভাল বুদ্ধি। ক'টা বাজে?' ঘড়ি দেখল কিশোর। 'খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। বিকেলের আগে আসবে না বুড়ো। দুটোর সময় আমাদের বাড়ির সামনে রাস্তার মাথায় চলে আসবে সবাই।'

'কিন্তু, কিশোর, একটা কথা,' আঙুল তুলল রবিন, 'চোরগুলোর ধরা পড়ার সংবাদ নিশ্চয় শুনেছে বুড়ো। তারপরেও কি মেসেজ ডেলিভারি দিতে আসার সাহস পাবে?'

'এ কাজের জন্যে নিশ্চয় অনেক টাকা পেয়েছে। ঝুঁকিটা নেবে সে।'

তেরো

সেদিন বিকেলে গাঁয়ের ভিতরের লেমোনেড শপটার সামনে সাইকেলগুলো রেখে দোকানে ঢুকল চার গোয়েন্দা–মুসা, রবিন, ফারিহা আর টিটু। কিশোর ওদের সঙ্গে নেই। সে একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসে খবরের কাগজ পড়বার ভান করছে। তার সাইকেলটা পাশে মাটির উপর শুইয়ে রেখেছে।

বুড়োর আসবার অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। আসবে তো?

বেশিক্ষণ বসতে হলো না। ঠিকই এল বুড়ো। পা টেনে টেনে গিয়ে বসল বেঞ্চটায়। লাঠিতে ভর দিয়ে ঝিমাতে শুরু করল।

খানিক পরেই একটা শব্দ চমকে দিল গোয়েন্দাদের। হর্নের শব্দ। মুখ তুলে তাকাল কিশোর। রাস্তার মোড় পেরিয়ে এগিয়ে আসছে একটা সাইকেল।

বেঞ্চের কাছে গিয়ে আরেকবার হর্ন বাজিয়ে সাইকেল থেকে নামল লোকটা। সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে রেখে বুড়োর পাশে বেঞ্চে বসল।

মুখ তুলল না বুড়ো। আগের মতই চোখ বোজা। কী করে বুঝবে সে এই লোকটাই মোমের পুতুল?

কী করে বুঝবে বুঝে ফেলল কিশোর হঠাৎ। হর্নের শব্দ! বেঞ্চের কাছে পৌঁছে একবার বাজিয়েছে লোকটা। বুড়ো কালা হলেও এতটা কালা নয় যে হর্নের জোরাল শব্দ শুনবে না।

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কিশোর। নড়ছে না বুড়ো। পকেটে হাত ঢোকাচ্ছে না। মেসেজ দেবে কী করে?

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ থাকবার পর সামান্য নড়ে উঠল বুড়ো। মুখ তুলল। লোকটার দিকে তাকাল না। লাঠি দিয়ে মাটিতে খোঁচাতে শুরু করল। খোঁচাচ্ছে?

নাকি কিছু লিখছে? দূর থেকে বুঝবার উপায় নেই।

মিনিট দুয়েক পর উঠে দাঁড়াল আগন্তুক। সাইকেলে চেপে একবার হর্ন বাজিয়ে প্যাডালে চাপ দিল।

লেমোনেড শপে শক্ত হয়ে গেছে কিশোর গোয়েন্দারা। কী জন্য এসেছিল লোকটা? ওকে কোন মেসেজ দিতে দেখেনি বুড়োকে। শক্ত হয়ে গেল ওরা, যখন দেখল দোকানের দিকে এগিয়ে আসছে লোকটা। এখানে আসছে কেন?

ভিতরে ঢুকল লোকটা।

অস্ফুট শব্দ করে উঠল ফারিহা। টেবিলের নীচ দিয়ে তার পায়ে লাথি মেরে ওকে চুপ থাকবার ইঙ্গিত করল মুসা। লোকটার দিকে এক নজর তাকিয়ে চামচ দিয়ে গেলাসের বরফ নাড়তে লাগল ফারিহা।

কাউন্টারের সামনে গিয়ে পয়সা রেখে লোকটা বলল, 'একটা দেশলাই দিন।'

সন্দেহ করে বসতে পারে, এই ভয়ে তার দিকে তাকাল না মুসা কিংবা রবিন। কিন্তু ফারিহা না তাকিয়ে পারল না।

সিগারেট ধরিয়ে বেরিয়ে গেল লোকটা।

ফিসফিস করে ফারিহা বলল, 'এই লোকই! দুই চোখ দুই রঙের!'

কিশোর ওদিকে লোকটাকে উঠতে দেখেই কাগজ ভাঁজ করে ফেলেছে। সে লেমোনেড শপ থেকে বেরিয়ে রওনা হতেই সাইকেলে করে কিশোরও তার পিছু নিল। মেসেজ পেয়েছে কিনা শিওর হতে পারছে না।

মুসারাও বেরিয়ে পড়ল।

নদীর দিকে চলেছে লোকটা। মেলায় ঢুকল। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে এগোল মোমের পুতুল রাখা হলঘরটার দিকে। কিন্তু ঢুকল না। খোলা দরজা দিয়ে একবার উঁকি দিল মাত্র।

জানালা দিয়ে উঁকি দিল কিশোর। পুতুলের প্রদর্শনী চলছে। লাল-চুল একটা ছেলে হাত নেড়ে নেড়ে দর্শকদের কাছে গল্প করছে, কী করে রাতের বেলা আপনাআপনি ন্যাংটো হয়ে গিয়ে আলমারিতে ঢুকে বসে ছিল নেপোলিয়ন; কী করে পুলিশের মূর্তিটা পর্দার আড়ালে চলে গিয়েছিল।

'গুল মারছে!' মুখ বাঁকিয়ে বলল একটা বারো-তেরো বছরের মেয়ে।

তাকে সমর্থন করে চুল ঝাঁকাল আরেকজন, 'গাঁজা!'

মুচকি হাসল কিশোর। আরও শোনার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সরে যাচ্ছে লোকটা।

পাতাবাহারের একটা বেড়ার ধারে সাইকেল রাখল মোমের পুতুল। তালা দিল। বসে পড়ল ঘাসের উপর। বোঝা গেল, কিছুক্ষণ বসবার ইচ্ছে আছে এখানে।

মুসাদের মেলায় ঢুকতে দেখে এগিয়ে গেল কিশোর। বলল, 'এমন ভঙ্গি করো, যেন মেলা দেখতে এসেছ।'

বেশিক্ষণ একভাবে বসে থাকতে ভাল লাগল না যেন লোকটার। উঠে ঘুরে বেড়াতে লাগল মেলার মধ্যে। অনিশ্চিত, অস্থির ভাবভঙ্গি। মাঝে মাঝেই গিয়ে উঁকি মেরে আসছে মোমের পুতুলের ঘরে। কিন্তু ভিতরে ঢুকছে না।

অবাক লাগল কিশোরের। এমন করছে কেন? ওখানে তার সঙ্গে কারও দেখা করবার কথা?

আরও কয়েক মিনিট ঘোরাঘুরি করে একটা খাবারের দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল লোকটা, 'অনেক ভিড় মনে হচ্ছে আজকে?'

মাথা ঝ কাল দোকানি। 'হ্যাঁ। আশপাশের সব ক'টা গাঁ থেকে লোক এসেছে মেলা দেখতে ব্যবসা খুব ভাল আজকে।'

'ক'টা পর্যন্ত চলবে?'

'সন্ধ্যার আগে কেউ যাবে বলে মনে হয় না।'

আনমনে মাথা ঝাঁকাল মোমের পুতুল। সাইকেলের দিকে এগোল। তালা খুলে চেপে বসল তাতে।

কিশোর বুঝতে পেরেছে, কিছু একটা করতে চায় লোকটা। কিন্তু মেলা চলছে, লোকের ভিড়ের মধ্যে সেটা করতে পারছে না সে। হয়তো ভিড় কমলে পরে ফিরে আসবে। কোথায় যায় জানা দরকার। সঙ্গীদের মেলায় থাকতে বলে পিছু নিল সে। হঠাৎ চোখে পড়ল আরেকটা বেড়ার পাশে সাইকেলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অতি পরিচিত একজন লোক। কনস্টেবল ফগর্যাম্পারকট! সাদা পোশাকে রয়েছে সে। তবে কি সে-ও মোমের পুতুলের পিছু নিয়েছে?

মেলা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়ল মোমের পুতুল।

সাইকেলে চাপল ফগ।

আর কোন সন্দেহ রইল না কিশোরের, ফগও লোকটার পিছু নিয়েছে। খোয়া যাওয়া হারটা নিয়ে সে-ও মাথা ঘামাচ্ছে। বুঝতে পেরেছে, মোমের পুতুলের পিছু নিতে পারলে ওটা কোথায় আছে জানা সম্ভব। নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে থেকে বুড়ো জনসনের ওপর নজর রেখেছিল। তারপর মোমের পুতুলের পিছু নিয়ে চলে এসেছে মেলায়।

প্রায় গুঙিয়ে উঠল কিশোর। আবার ঝামেলা পাকাতে এসেছে ফগটা! পুলিশকে চিনতে পারলেই সতর্ক হয়ে যাবে মোমের পুতুল। হয়তো আর যাবেই না হারটার কাছে!

আগে আগে চলেছে মোমের পুতুল। মাঝে ফগ। পেছনে কিশোর। মনে মনে বকছে ফগকে—আসবার আর সময় পেল না হতচ্ছাড়াটা! আগের রাতে মোমের পুতুলের মধ্যে লুকিয়ে থেকে কী গোলমালটাই না বাধিয়েছে, ভাবতে তেতো হয়ে গেল তার মন।

ইতিমধ্যে বার দুয়েক ফিরে তাকিয়েছে মোমের পুতুল। ফগকে চিনতে

পেরেছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। পারলেও সেটা চেপে রেখেছে, বুঝতে দিচ্ছে না।

কিন্তু মিনিট পনেরো পরই বুঝে ফেলল কিশোর, ফগকে চিনতে পেরেছে লোকটা। আসল জায়গায় না গিয়ে তাই ঘুরিয়ে মারছে তাকে। ইচ্ছে করেই পাহাড়ী পথ বেছে নিয়েছে সে, যাতে সাইকেল চালাতে কষ্ট হয়।

মোমের পুতুলের স্বাস্থ্য খুব ভাল, তার তেমন অসুবিধে হচ্ছে না। কিন্তু ফগ বেচারার জান বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড়। মোটা শরীর নিয়ে হাঁপাচ্ছে সে, দরদর করে ঘামছে। কিশোরকে দেখে ফেলেছে সে। চোরটা যে তাকে খাটিয়ে মারছে, এটাও বুঝেছে। কিন্তু কিছু করবার নেই। পিছে লেগে থাকতেই হবে।

'কোনমতেই ছাড়া যাবে না ওকে!' প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছে কনস্টেবল ফগর‍্যাম্পারকট; কারণ পেছন পেছন আসছে কিশোর পাশা। ওই বিচ্ছু ছেলেটা ছাড়বে না, ঠিক অনুসরণ করে যাবে। সুতরাং অমানুষিক কষ্ট করে দাঁতে দাঁত চেপে এগিয়ে চলল ফগ। আর পরাজিত হতে রাজি নয় পাজি ছেলেমেয়েগুলোর কাছে। মোমের পুতুলকে ধরবার এটাই শেষ সুযোগ।

সামনে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে উঁচু পাহাড়। তরতর করে উঠে যাচ্ছে মোমের পুতুল।

পিছিয়ে পড়ছে ফগ। প্রাণপণে প্যাডালে চাপ দিচ্ছে। লাল মুখ টকটকে লাল হয়ে গেল। চোখ দুটো মনে হচ্ছে বেরিয়ে যাবে। বাতাসের জন্য হাঁসফাঁস করছে ফুসফুস।

কিশোরেরও কষ্ট হচ্ছে। কারণ সে-ও মোটা মানুষ। বার বার কসম খেলো, শরীর মোটা আর রাখবে না। যে করেই হোক ওজন কমাতে হবে। ভারি শরীর নিয়ে পরিশ্রম করা যায় না।

এই সময় ভাবনাটা খেলে গেল মাথায়। আচ্ছা, অহেতুক পরিশ্রম করে লাভ কী? মোমের পুতুলের কাছে ফাঁস হয়ে গেছে ওদের অস্তিত্ব। পিছু নিয়েছে যে দেখে ফেলেছে। নেহায়েত গাধা না হলে এখন হারটার কাছে যাবে না সে। আর গাধা যে সে নয়, এ তো জানা কথা।

থেমে গেল কিশোর। হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গি করল।

ফিরে তাকাল ফগ।

তার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল কিশোর–অর্থাৎ, এগিয়ে যাও মিয়া, বোঝোগে ঠেলা। আমি আর এই গাধামিতে নেই। ফিরে চললাম মেলায়।

সাইকেল ঘোরাল সে।

চোদ্দ

মেলায় ফিরে এল কিশোর। তাকে দেখে ছুটে এল সহকারী গোয়েন্দার দল। ঘিরে ধরল। উত্তেজিত হয়ে জানতে চাইল, ব্যাপার কী? অত তাড়াতাড়ি ফিরল কেন কিশোর? হারটা কোথায় জানতে পেরেছে কিনা?

গলাটা শুকিয়ে গেছে। এক বোতল লেমোনেড নিয়ে এসে ঘাসের উপর বসল কিশোর। খুলে বলল সব কথা।

মুখ বাঁকিয়ে মুসা বলল, 'ওই গর্দভ ঝামেলাটা খালি ঝামেলা বাধায়! সব কেচে দিল আজও!'

'হ্যাঁ, ওর জন্যেই সর্বনাশটা হলো!' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'তবে আমি জানি, আবার মেলায় ফিরে আসবে মোমের পুতুল। তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।'

'আদৌ ওকে মেসেজ দিয়েছে কিনা বুড়ো, কে জানে! কিছুই তো দিতে দেখলাম না।'

মাথা ঝাঁকাল ফারিহা। বলল, 'হ্যাঁ, দেখলাম বসে বসে ঝিমাল। একবার কেবল মাথা তুলে লাঠি দিয়ে মাটিতে খোঁচাল...'

আচমকা লেমোনেড খাওয়া থামিয়ে দিল কিশোর। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। কপাল চাপড়ে বলল, 'উফ্, আমি একটা গাধা! এত কষ্ট করার কী দরকার ছিল!'

'মানে!' কেউ কিছু বুঝতে পারল না।

'মাটিতে দেখলেই হত!' জবাব দিল কিশোর।

'মাটিতে মানে!' এবারও কেউ বুঝল না।

'লাঠি দিয়ে মাটিতে কিছু লিখেছে বুড়ো! ওইটাই মেসেজ!' লেমোনেড আর শেষ করল না কিশোর। বোতলটা ছুঁড়ে ফেলে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'জলদি চলো!'

সেই বেঞ্চটার কাছে ফিরে এল ওরা। বুড়ো চলে গেছে। বসে আছে আরেকজন লোক। বুড়ো যেখানটায় বসেছিল সেখানে বসে মাটির দিকে তাকাল কিশোর। চিউয়িং গামের মোড়ক পড়ে আছে। আরও কেউ বসেছিল এখানে। জুতোর চাপ লেগে লেখার বেশির ভাগটাই মুছে গেছে। দুটো অক্ষর কেবল বোঝা যায়: W এবং X.

রবিন, মুসা আর ফারিহাও ঝুঁকে পড়েছে লেখাটার উপর। টিটু অবাক হয়ে

তাকিয়ে আছে। বুঝতে পারছে না, মাটিতে কী দেখছে তার বন্ধুরা। খরগোশ কিংবা ইঁদুরের গন্ধ নেই মাটিতে। কোন খাবারও নেই। তা হলে?

অবাক হয়েছে বেঞ্চে বসা লোকটাও। কী করছে ছেলেমেয়েগুলো?

রবিন বলে উঠল হঠাৎ, 'ডব্লিও, অ্যা, অ্যাক্স! তারমানে ওয়্যাক্স, তারমানে মোম, এবং অর মানে মোমের পুতুলের ঘর!'

'ঠিক বলেছ!' উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'আবার মেলায় যেতে হবে আমাদের! মোমের পুতুলের ঘরেই আছে জিনিসটা। সে-জন্যেই বার বার ভেতরে উঁকি দিচ্ছিল লোকটা। লোকজন আছে বলে বের করতে যেতে পারছিল না।'

মেলায় ফিরে এল ওরা। লোকের ভিড় তখনও কমেনি। পুতুলের ঘরেও ভিড় আছে। সেই লাল-চুল ছেলেটা নতুন লোক ঢুকলেই তাদের কাছে নেপোলিয়ন আর পুলিশের মূর্তি সরে যাওয়ার গল্প করছে। কিশোরদের দেখে আরেকবার বলতে গেল। কিন্তু শুনল না ওরা। বেরিয়ে এল।

ভিড় কমবার অপেক্ষায় রইল। এত লোকজনের সামনে হার খোঁজা যাবে না। সুযোগ পেয়ে গেল একটু পরই। চা খাওয়ার ছুটি হলো। সব দর্শককে বের করে দিয়ে দরজা ভেজিয়ে বেরিয়ে গেল লাল-চুল ছেলেটা।

টুক করে ঢুকে পড়ল গোয়েন্দারা।

সারা ঘর গরুখোঁজা করে ফেলতে লাগল ওরা। পর্দার আড়াল, আলমারির ভিতর, চিমনির ভিতর—মোট কথা একটা হার লুকানো থাকতে পারে এমন কোন জায়গাই বাদ দিল না।

অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে মুসা বলল, 'মনে হচ্ছে এখানে নেই!'

নীচের ঠোঁটে ঘন ঘন চিমটি কাটছে কিশোর। হঠাৎ বলল, 'পুতুলগুলোতে খুঁজিনি আমরা!'

'পুতুল! ওগুলোতে কি আর ফোকর আছে? কোথায় লুকাবে?'

জবাব না দিয়ে দ্রুতপায়ে পুতুলের সারির দিকে এগোল কিশোর। উজ্জ্বল আলো নিভিয়ে ম্লান একটা আলো জ্বেলে দিয়ে গেছে লাল-চুল ছেলেটা। উজ্জ্বল আলোটা আবার মুসাকে জ্বেলে দিতে বলল কিশোর।

দ্বিতীয় সারির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে রানী ভিকটোরিয়ার মূর্তি। তার সামনে এসে দাঁড়াল কিশোর। গলার দিকে তাকাল। পাথর বসানো তিনটে হার ঝোলানো আছে পুতুলের গলায়। আলোয় ঝিকঝিক করছে, রামধনুর সাতরঙের ছটা দেখা যাচ্ছে। চতুর্থ হারটাও উজ্জ্বল, তবে রঙ নেই অন্যগুলোর মত। হাত বাড়িয়ে ওই হারটা খুলে আনল কিশোর। চাপা গলায় বলল, 'মনে হয় এইটাই! বুদ্ধি আছে ব্যাটার! এমন জায়গায় লুকিয়েছে, সবার চোখের সামনে থাকবে, কিন্তু কেউ কিছু বুঝতে পারবে না! কল্পনাই করবে না এখানে সাধারণ একটা পুতুলের গলায় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে অত দামী একটা গহনা!'

'তারমানে পেয়ে গেলাম আমরা হারটা!' হাততালি দিয়ে নেচে উঠল ফারিহা। 'ফগের আগেই রহস্যের সমাধান করে ফেললাম!'

'এবং চোরটা নিতে পারল না হারটা!' যোগ করল মুসা।

ঘর থেকে বেরিয়েই একেবারে ক্যাপ্টেন রবার্টসনের মুখোমুখি পড়ে গেল ওরা।

কিশোর বলল, 'আরি, স্যার, আপনি? হারটা খুঁজতে এলেন বুঝি?'

'তুমি এখানে কী করছ?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন ক্যাপ্টেন। 'আমি তো ভেবেছি, মোমের পুতুলের পেছনেই লেগে আছ।'

'তাই করেছিলাম। ফগও তাই করেছে। কেন, আমাকে চলে আসতে দেখেনি সে?'

'দেখেছে। ভাবল, এত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র তুমি নও। হয়তো কোন ভাবে চোরটার ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করেছ। ফগকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে মোমের পুতুল। আমাকে ফোন করেছিল ফগ। অফিসে আর থাকতে পারলাম না। চলে এলাম।'

'মিস্টার ফগর‍্যাম্পারকট অনুসরণ করায় আমি আর থাকার প্রয়োজন মনে করিনি। তার চেয়ে বরং হারটা খুঁজে বের করা যায় কিনা সেই চেষ্টা করেছি।'

'কোন সূত্র পেয়েছ?'

হাসিমুখে পকেটে হাত ঢোকাল কিশোর। নাটকীয় ভঙ্গিতে বের করে আনল হারটা। তুলে দিল ক্যাপ্টেনের হাতে।

এই সময় সেখানে এসে হাজির হলো ফগ। মেলার মধ্যে নজর রাখবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছিল সে। ক্যাপ্টেনের হাতে হার দেখে গোল চোখ কপালে উঠে গেল তার।

ফারিহা বলল, 'মার্বেল!'

কিন্তু সাংঘাতিক উত্তেজিত থাকায় তার কথাটা কানে গেল না ফগের। বিড়বিড় করতে লাগল, 'ঝামেলা! কোথায় পেলেন এটা, স্যার?'

'কিশোর দিয়েছে!'

'ও পেল কোথায়?'

'ওকেই জিজ্ঞেস করো।'

কি করে হারটা খুঁজে বের করেছে জানাল গোয়েন্দারা। আরও একবার কিশোর গোয়েন্দাদের কাছে হেরে গিয়ে মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে রইল ফগ। ক্যাপ্টেনের মুখে ওদের প্রশংসা শুনতে হলো ভগ্ন হৃদয়ে। কিন্তু করবার কিছু নেই। মনে মনে স্বীকার করতেই হলো, কিশোর পাশা তার চেয়ে বুদ্ধিমান।

তার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়ার জন্যই যেন হেসে বললেন ক্যাপ্টেন, 'কী মনে হয়, ফগর‍্যাম্পারকট? কিশোর পাশার বুদ্ধি তোমার চেয়ে বেশি, তাই

না?'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল ফগ।

ক্যাপ্টেন বললেন, 'সবই তো হলো, একটা কাজ বাকি রয়ে গেল। হাতছাড়া হয়ে গেল মোমের পুতুল। আবার দল গড়বে, চুরিদারি করে বেড়াবে। তাকে ধরতে পারা উচিত ছিল।'

'ইচ্ছে করলে এখনও ধরা যায়, স্যার,' হেসে বলল কিশোর।

ভুরু কুঁচকে ফেলল ফগ। কিশোরের দিকে ফিরল তার মার্বেল চোখ। 'ঝামেলা! কী ভাবে?'

'অতি সহজ,' জবাব দিল কিশোর। 'হারটা যে আমরা পেয়ে গেছি, সে জানে না। মেলায় ফিরে আসবেই। হলঘরে ঢুকবে হারটা নেয়ার জন্যে...'

আর শুনবার অপেক্ষা করলেন না ক্যাপ্টেন। আদেশ দিলেন, 'ফগর্যাম্পারকট, আমার অফিসে ফোন করো। ফোর্স পাঠাতে বলো। জলদি!'

'ইয়েস, স্যার!' বলে তাড়াহুড়ো করে চলে গেল ফগ।

পরদিন সকালে খবরের কাগজ খুলেই মোমের পুতুলের ধরা পড়বার খবরটা জানতে পারল গোয়েন্দারা। হলঘরের চারপাশে লুকিয়ে ছিল ছদ্মবেশী পুলিশ। চোরটা যেই ঢুকেছে, অমনি পিস্তল হাতে গিয়ে ধরে ফেলেছে তাকে।

মুসাদের বাড়িতে আড্ডা বসিয়েছে ওরা, এই সময় ফোন এল ক্যাপ্টেনের। কিশোর ধরল। অনেক ধন্যবাদ দিলেন তিনি। তাঁর সবশেষ কথাটা দাগ কাটল ওর মনে। তিনি বললেন, 'পুলিশে ঢোকার ইচ্ছে থাকলে এখন থেকেই তৈরি হও। সোনার টুকরো ছেলে তোমরা, দেশের অনেক উপকার করতে পারবে!'

বিশ্বাস হতে চাইল না ফারিহার। সত্যি তিনি এমন করে বলেছেন? এতটা প্রশংসা করেছেন?

****

ছবিরহস্য

এক

'জিনিসটা অদ্ভুত!' কিশোর বলল। সরু একটা লণ্ঠন উঁচু করে ধরল সবার দেখবার জন্য। চিমনির ভিতরে লাল-কমলায় মিশানো এক ধরনের থকথকে জিনিস।

'কুচ্ছিত!' নাক কুঁচকাল মুসা। 'কী ওটা?'

হাসল রবিন। 'জানি না। তবে যে ভাবে নাক কুঁচকাচ্ছ, লোকে দেখলে আগ্রহ হারাবে। কিনতেই চাইবে না। ওটার মালিকও আর টাকা পাবে না।'

সাতদিনের একটা 'গ্যারেজ সেল'-এ সাহায্য করতে রোজানদের বাড়িতে এসেছে তিন গোয়েন্দা। রোজানরা কিশোরদের পড়শী। রোজানদের মেয়ে অনি রোজান ওর বন্ধু। এক স্কুলে একই ক্লাসে পড়ে।

গ্যারেজ সেল মানে পুরানো মাল বেচাকেনার মেলা গ্যারেজের সামনে বসে এ ধরনের মেলা। এ বছর রোজানদের বাড়িতে এই গ্যারেজ সেলের আয়োজন করা হয়েছে। অনি আর তার আম্মার অনুরোধে ওদেরকে সাহায্য করতে এসেছে তিন গোয়েন্দা।

বিক্রি শুরু হওয়ার ঘণ্টাখানেক আগে। রোজানদের গ্যারেজ আর সামনের গাড়িপথে প্রচুর ব্যস্ততা। বাক্স বোঝাই করে পণ্য নিয়ে আসছে পাড়ার লোকজন। বাক্স থেকে সে-সব জিনিস বের করে টেবিলে সাজিয়ে রাখবার দায়িত্ব নিয়েছে তিন গোয়েন্দা।

একটা পিকআপ ট্রাক ঢুকল। তাতে বোঝাই পুরানো আসবাবপত্র। সেগুলো নামাতে পিকআপের মালিককে সাহায্য করতে ছুটে গেল মুসা।

'কে কোন জিনিস নিয়ে আসছে, লিখে রাখতে হবে,' অনির আম্মা মিসেস রোজান বললেন। মা-মেয়ে দু'জনে মিলে ট্যাগ লাগাচ্ছেন জিনিসের গায়ে।

কিশোরের হাতের লণ্ঠনটার দিকে আঙুল তুললেন মিসেস রোজান। 'ওই লাভা ল্যাম্পটাও নিশ্চয় বিক্রির জন্যে। ওটার গায়েও ট্যাগ লাগাতে হবে।'

'লাভা?' চোখ বড় বড় হয়ে গেল মুসার। 'ওর মধ্যে ওই থকথকে জিনিসগুলো লাভা? আগ্নেয়গিরি থেকে যা বেরোয়?'

'আসল লাভা না ওটা, মুসা,' হেসে বললেন মিসেস রোজান। 'কারখানায় বানানো। আলো হয় না, তবে রাতে এক ধরনের হলদে আভা বেরোয়। ভাল লাগে দেখতে। লোকে ঘর সাজায়।' হাতের ক্লিপবোর্ডটার দিকে তাকালেন একবার তিনি। মুখ তুলে তাকালেন মেয়ের দিকে। 'লিস্টে বারো নম্বরে আছে

রনসনদের নাম। ওই লাভা ল্যাম্পটা যাদের। জিনিসটার গায়ে বারো নম্বরের ট্যাগ লাগাতে হবে। নম্বরের পাশে দামটাও লিখে দিতে হবে।...কত দাম চাওয়া যায়? পাঁচ ডলার?'

'হ্যাঁ, ঠিকই আছে, পাঁচের বেশি হবে না,' অনি বলল। ওর বেগুনি কালির ম্যাজিক মারকার পেনটার ক্যাপ খুলল সে। সাদা ছোট এক টুকরো স্টিকারের গায়ে গোটা গোটা করে লিখল, নম্বর: ১২। দাম: ৫ ডলার। তারপর স্টিকারের আঠা লাগানো দিকটা লাগিয়ে দিল লাভা লণ্ঠনের গায়ে। বিড়বিড় করে বলল, 'জিনিসটা সুন্দর!'

নিজের নিয়ে আসা একটা বাক্স থেকে চামড়ার তৈরি পুরানো একটা দস্তানা টেনে বের করল রবিন। বেসবল খেলার সময় হাতে পরত সে। অনিকে জিজ্ঞেস করল, 'এটা আমি বেচব। আমার নম্বর কত?'

মা'র হাতের ক্লিপবোর্ডটা দেখে অনি বলল, 'তোমার নম্বর পাঁচ। কত হলে বেচবে?'

'দুই ডলার? বেশি লাগছে?'

মাথা নাড়ল অনি, 'না, ঠিকই আছে।' স্টিকারে নম্বর: ৫। দাম: ২ ডলার লিখে কলমের ক্লিপের সঙ্গে আটকে দিল।

দস্তানার সঙ্গে একটা খেলনা গাড়িও এনেছে রবিন। অনেক ছোটবেলায় গাড়িটা নিয়ে খেলত সে। পুরানো মডেল। স্প্রিঙে চলে ইঞ্জিন। এখনকার ব্যাটারি-চালিত ইঞ্জিনগুলোর মত নয়। বহুকাল ওদের মাটির নীচের ঘরে অবহেলায় পড়ে ছিল। ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে দেখে ইঞ্জিনটা এখনও ভাল আছে। চাবিতে মোচড় দিলে চালু হয়। দাম আর নম্বর লিখে এটার গায়েও স্টিকার লাগিয়ে দেয়া হলো।

কিশোর এনেছে একটা পারকা। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় গায়ে দিয়ে খুব আরাম। কিন্তু এখন আর গায়ে লাগে না। ওর মাপে অনেক ছোট হয়ে গেছে।

মুসা নিয়ে এসেছে একটা ক্রিকেট ব্যাট আর আধ ডজন গানের সিডি। এই ব্যাট দিয়ে প্রচুর খেলেছে সে। বিক্রি করে দিতে পারলে নতুন আরেকটা কিনবে। সিডিগুলো শুনতে শুনতে পচে গেছে। গানগুলো এখন আর ভাল লাগে না।

অনি বিক্রি করবে দুই বছর আগে বানানো একটা হ্যালোউইনের পোশাক।

বিক্রেতাদের রেখে যাওয়া একটা বাক্স খুলে পুরানো একটা ক্যান্ডির বাক্সে চমৎকার একটা কলম পেয়ে গেল কিশোর। পুরানো আমলের জিনিস। বাড়িতে যে বলপেন কলমটা এখন ব্যবহার করে সে, এই কলমটা সেটার মত নয়। গায়ে খোদাই করে লেখা রয়েছে ইংরেজি 'কে' অক্ষরটা। তাতে সোনালি রঙ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে এত নিখুঁতভাবে, ফুটে রয়েছে ইংরেজি অক্ষরটা। নিশ্চয় যার জিনিস, তার নামের আদ্যাক্ষর।

বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর। নাটকীয় ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'কে দিয়ে কী হয় বলো তো?'

'কিশোর!' সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল মুসা, রবিন ও অনি।

'একেই বলে কাকতালীয় ঘটনা,' কিশোর বলল। 'কে দিয়ে কিশোর। আরও অনেক নামই হতে পারে। তবে যেহেতু বিক্রি করতে নিয়ে এসেছে, জিনিসটা আমারই হওয়া উচিত এখন, কী বলো? দেখি, আমার পারকাটা বিক্রি হয় কিনা। তাহলে ওই পয়সা দিয়ে কলমটা আমি কিনতে পারব। আমার নতুন লাল নোটবুকটাতে শুধু এই কলম দিয়েই লিখব আমি।'

কিশোর পাশার দামী 'লাল' নোটবুকের কথা মুসাও জানে, রবিনও জানে। জন্মদিনে উপহার দিয়েছেন মেরিচাচী। কিশোর ঠিক করেছে, এখন থেকে নতুন যে কোনো কেসের মূল্যবান তথ্য, জরুরী মন্তব্য, কেসের সারাংশ এই নোটবুকে লিখে রাখবে সে। নোটবুকের মলাটে বাংলায় বড় বড় করে নিজের নামটা লিখে রেখেছে কিশোর।

কিশোরের যখন মাত্র দুই বছর বয়েস, তখন মোটর-দুর্ঘটনায় একসঙ্গে মারা গেছেন ওর বাবা-মা। তারপর থেকে চাচা-চাচীর কাছেই আছে সে। ওর চাচীর ভাল নাম মারিয়া পাশা। আমেরিকান। কিশোরকে মায়ের যত্ন দিয়ে মানুষ করেন নিঃসন্তান এই মহিলা। কারো কাছে কিশোরের পরিচয় দিতে গেলে 'আমার ছেলে কিশোর' বলে পরিচয় দেন।

কিশোরের চাচার নাম রাশেদ পাশা। আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেসের রকি বীচে স্যালভিজ ইয়ার্ড আছে তাঁর, নাম 'পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ড'। পুরানো মাল বেচাকেনার ব্যবসা করেন তিনি।

স্কুলের সবাই জানে, এই বয়েসেই বড় গোয়েন্দা হয়ে গেছে কিশোর। কোন রহস্য পেলে সমাধান না করে স্বস্তি নেই। তার সহকারী হয়েছে দুই বন্ধু মুসা ও রবিন। মুসা আমেরিকান নিগ্রো। মুসলমান। রবিন আইরিশ। মুসার বাবা সিনেমার স্পেশাল ইফেক্ট ডিরেক্টর। রবিনের বাবা সাংবাদিক। কিশোর মুসা রবিন তিনজনে মিলে একটা গোয়েন্দা সংস্থা গঠন করেছে, নাম দিয়েছে 'তিন গোয়েন্দা'। পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডের একধারে লোহা-লক্কড়ের স্তূপ। তার নীচে চাপা পড়েছে পুরানো একটা মোবাইল হোম। ওটার ভেতরে 'তিন গোয়েন্দা'র হেডকোয়ার্টার বানিয়েছে কিশোর মুসা রবিন।

কাহিনীতে ফিরে আসা যাক। টেবিলে রাখা একটা পুঁতির মালা তুলে নিল অনি। রোদ লেগে ঝিক করে উঠল লাল রঙের ছোট ছোট কাঁচের বলগুলো। হারটা গলায় ঠেকাল অনি। কিশোরকে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগছে? মানাবে?'

'খুব,' মাথা কাত করে জবাব দিল কিশোর।

খুশি হলো অনি। 'হ্যালোউইনের পোশাকটা বেচতে পারলে আমি এটা

'আমি পড়ে গেছি বিপদে,' রবিন বলল। 'দুটো জিনিস পছন্দ হয়েছে আমার। এক বাক্স ভিডিও গেমের সিডি আর এক বাক্স কমিক বইয়ের কালেকশন। কোনটা নেব বুঝতে পারছি না।'

'না পারার কী হলো?' হেসে বলল অনি। 'তুমি হলে বইয়ের পোকা। শেষ পর্যন্ত কমিকগুলোই যে নেবে তুমি, কোন সন্দেহ নেই আমার।'

হাসল রবিন। 'ঠিকই বলেছ।'

মুসা জানে না সে কী কিনবে কেনার মত জিনিস এখনও চোখে চোখে পড়েনি তার। বলল, 'আমি কি কিনি বলো তো?'

'দেখো চকলেট কিংবা বিস্কুটের বাক্স পাও নাকি,' রসিকতা করে বলল রবিন। 'বাসি বিস্কুট হলেও তো কিনে খাওয়া শুরু করবে।'

আঙুল তুলে একটা বাক্স দেখাল অনি। নানা রকম ক্যাপ রয়েছে তাতে। 'ওগুলো থেকে একটা নিতে পারো খেলতে-টেলতে যাও যেহেতু। খুব কাজে লাগবে।'

মাথা নাড়ল মুসা। 'নাহ্, ও রকম ক্যাপ আমার আছে। অন্য কিছু দরকার।' ঘুরতে ঘুরতে একটা জিনিসের উপর গিয়ে স্থির হলো তার দৃষ্টি। উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখ। 'ওই যে পেয়ে গেছি! ওটাই কিনব!'

দূরের একটা টেবিলে রাখা একটা ছবির দিকে হাত তুলল সে। ক্যানভাসে আঁকা একটা ছবি। একজন কিশোরী ব্যালেরিনা ডান্সারের। সাদা পোশাক পরা। মাথার হ্যাটটা সাদা। তাতে যে ফুলগুলো গোঁজা, সেগুলোও সাদা। পাশে কাত হয়ে একটা হাত সোজা করে দিয়েছে মেয়েটা। এক পায়ের তালু হাঁটুতে ঠেকানো। নাচের একটা কঠিন মুদ্রা। তবে দেখতে খুব সুন্দর। তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

তাড়াহুড়া করে ছবিটার কাছে এসে দাঁড়াল মুসা। দেখতে দেখতে বলল, 'দারুণ, তাই না?' পাশে দাঁড়ানো কিশোরের দিকে তাকাল। 'আমার শোবার ঘরে কেমন মানাবে, বলো তো? দেয়ালে ঝোলালে?'

'ভাল।'

মিসেস রোজানকে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'দাম কত?'

ক্লিপবোর্ডে আটকানো তালিকা দেখলেন মিসেস রোজান। 'দশ ডলারের কমে বিক্রি করতে মানা করে গেছে ছবির মালিক। অনি, লেখো তো, তেইশ নম্বর, দশ ডলার।'

নম্বর: ২৩। দাম: ১০ ডলার। একটা স্টিকারে লিখে ছবির পেছনে ক্যানভাসের গায়ে লাগিয়ে দিল অনি।

'খাইছে!' গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'দশ! এত টাকা কোথায় পাব? ইস্, কাল যে

নতুন সিডিটা কিনলাম, সেটা না কিনলেই হতো! কিন্তু কে জানত! সাপ্তাহিক হাতখরচের টাকা থেকে মাত্র আর দুটো ডলার আছে পকেটে।'

'তোমার পুরানো সিডিগুলো আর খেলনা কুকুরটা বেচতে পারলেই টাকা এসে যাবে,' কিশোর বলল।

'তা হয়তো আসবে,' মুসার চোখে সন্দেহ। 'কিন্তু আমার জিনিস বিক্রির আগেই যদি ছবিটা বিক্রি হয়ে যায়?'

চুপ হয়ে গেল কিশোর।

হাতঘড়ি দেখলেন মিসেস রোজান। 'বিক্রি শুরু হতে আর মাত্র আধঘণ্টা বাকি। তাড়াতাড়ি করো। কাজ শেষ করে ফেলি। একটু পরেই কাস্টোমার আসা শুরু করবে।'

দ্রুত হাত চালাল ওরা। বাক্স খুলে জিনিস বের করে সেগুলোতে স্টিকার লাগিয়ে টেবিলে সাজিয়ে রাখতে লাগল। এপ্রিলের গরম। কাজ করতে করতে ঘাম ছুটে গেল। গলা শুকিয়ে গেল কিশোরের। মুসা বলল, 'খিদে পেয়েছে।'

ওদের জন্য একটা টেবিলে খাবারের প্যাকেট আর ড্রিংকস রাখাই আছে। খেয়ে নিতে বললেন মিসেস রোজান।

সাড়ে আটটায় ক্রেতা আসা শুরু হলো। বেশির ভাগকেই চেনে কিশোর। অচেনাদের মধ্যে রয়েছেন কালো চুলওয়ালা লম্বা এক ভদ্রলোক ও একজন লাল চুলওয়ালা মহিলা। স্বাভাবিকের তুলনায় খাটোই বলা চলে মহিলাকে। ভদ্রলোকের পরনে দামী সুট আর বো-টাই। মহিলার গায়ে বড় বড় রঙিন ফুলের ছাপমারা ঢোলা গাউন।

পণ্য সাজানো টেবিলগুলোর ফাঁকে ফাঁকে হাঁটতে লাগল ক্রেতারা। কখনও থামে। জিনিস দেখে। বুঝবার চেষ্টা করে, কেনা যায় কিনা। আবার হাঁটে।

'কী কাণ্ড দেখো!' মিসেস রোজান বললেন। 'নো আর্লি বার্ডস—লিখে দিয়েছি পত্রিকার বিজ্ঞাপনে, তারপরেও সময় হওয়ার আগেই চলে এসেছে। কেউ কোন কথার গুরুত্ব দেয় না!'

'আর্লি বার্ডস মানে?' কথাটার মানে জানে না মুসা।

'গ্যারেজ সেলের কতগুলো সাধারণ নিয়ম-কানুন আছে। ঠিক টাইমে আসতে হবে, সময় হওয়ার আগেই কারও কোন জিনিস কিনে ফেলা চলবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তারপরেও লোভ সামলাতে পারে না অনেকেই। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই চলে আসে। অন্যদের সঙ্গে টক্কর দিয়ে বাছা জিনিসগুলো কিনে ফেলতে চায়। এদেরকে বলে আর্লি বার্ড।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বিশেষ একটা ভঙ্গি করলেন মিসেস রোজান। 'তবে আসুক আর যাই করুক, এদের আমি প্রশ্রয় দেব না। যা বলে দিয়েছি, দিয়েছি। নিয়ম আমি ভঙ্গ করব না। কাঁটায় কাঁটায় ন'টায় বেচাকেনা শুরু হবে। তার আগে কোনোমতেই নয়।'

'ঠিক,' মায়ের সঙ্গে সুর মেলাল অনি। 'কোনোমতেই নয়। ওই যে, আরও দু'জন আর্লি বার্ড।'

কার কথা বলছে দেখবার জন্য ফিরে তাকাল কিশোর। নিনা হাওয়ার্ড আর জুলিয়া কনরকে গাড়িপথ ধরে হেঁটে আসতে দেখল। দু'জনেই অনির বান্ধবী, কিশোরদের স্কুলে পড়ে। নিনার একটা বিশেষ গুণ আছে। বাবার সহায়তায় ছোটদের একটা মাসিক পত্রিকা বার করে সে। এ জন্য গর্বে মাটিতে পা পড়ে না তার।

কাছে এসে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে টেবিলে সাজানো জিনিসগুলো দেখতে দেখতে নাক কুঁচকাল নিনা। 'ধূর, সবই তো একেবারে বাতিল মাল!' তারপর ব্যালেরিনা-ছবিটার ওপর চোখ পড়তে স্থির হয়ে গেল দৃষ্টি। তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি দূর হয়ে গেল চেহারা থেকে। জুলিয়ার গায়ে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বলল, 'তবে ওই ছবিটা কিন্তু দারুণ!'

'হ্যাঁ, আসলেই সুন্দর,' জুলিয়া জবাব দিল।

টেবিল ঘেঁষে দাঁড়াল নিনা। হাতে তুলে নিল ছবিটা। 'আমার বেডরুমে রাখলে ঘরের চেহারাই পাল্টে যাবে। কী বলিস?'

একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল জুলিয়া।

মুসার উপর চোখ পড়ল কিশোরের। কাজকর্ম থামিয়ে দিয়েছে মুসা। কান খাড়া করে দুই বান্ধবীর কথাবার্তা শুনছে। নিশ্চয় বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস শুরু হয়ে গেছে ওর, ভাবছে কিশোর।

'দাম কত?' নিনার প্রশ্ন।

'দেখো, পেছনে। নিশ্চয় স্টিকার লাগানো আছে।'

ক্যানভাসের পেছনে লাগানো ট্যাগটা দেখতে পেল নিনা। বলল, 'দশ ডলার।' ছবিটা টেবিলে নামিয়ে রেখে জিনসের পকেট থেকে টাকা বের করে গুনে দেখল। 'হয়ে যাবে। দশ ডলারই আছে। কিনে ফেলা যায়।'

ছুটে এসে কিশোরের হাত খামচে ধরল মুসা। নিনা যাতে শুনতে না পায়, ফিসফিস করে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'কিশোর, কিছু একটা করো! নিনা আমার ছবি নিয়ে যাচ্ছে!'

দুই

এ ব্যাপারে কিশোর কোন সাহায্য করতে পারল না। করল অনি। হাতের বেগুনি রঙের মার্কার পেন আর স্টিকারগুলো নামিয়ে রাখল সে। এগিয়ে গেল নিনা আর

জুলিয়ার দিকে।

'নিনা, কেমন আছো?' মুখে দরাজ হাসি নিয়ে জিজ্ঞেস করল অনি। 'জুলিয়া, তুমি?'

'ভাল।' দু'জনেই জবাব দিল।

'তোমরা কিন্তু আর্লি বার্ডস।'

'জানি,' হেসে জবাব দিল নিনা।

'কিছু পছন্দ করতে পারলে?'

নিনার হয়ে জবাবটা দিল জুলিয়া, 'নিনা এই ছবিটা কিনবে। আমি এখনও কিছু পাইনি।'

ওরা কী বলে ভালমত শুনবার জন্য আরেকটু কাছে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর ও মুসা।

এরপর অভিনয় শুরু করল অনি। বড় হয়ে অভিনেত্রী হওয়ার ইচ্ছে তার। সেজন্য এখন থেকেই তৈরি হচ্ছে। জুলিয়ার দিকে কাত হলো। কী সাংঘাতিক গোপন কথা যেন বলে ফেলছে এ রকম ভঙ্গিতে নিচু স্বরে বলল, 'শুধু তোমাকে বলছি, কাউকে বলবে না কিন্তু। ওল্ড লেডি মিসেস ওয়াগনার এক বাক্স গহনা নিয়ে এসেছেন। শুধু আমি ছাড়া আর কেউ দেখেনি এখনও ওগুলো। পুরানো আমলের জিনিস। কিন্তু যা সুন্দর না!...' থেমে গিয়ে চারপাশে তাকাল অনি। কেউ ওদের কথা শুনছে কিনা নিশ্চিত হয়ে নিল যেন। তারপর জুলিয়ার দিকে তাকিয়ে এক ভুরু উঁচু করে বলল, 'টেবিলে দেয়ার আগে দেখানোর নিয়ম নেই, তবু তোমাকে আমি এক নজর দেখাতে পারি। এখনও তো কিছু পছন্দ করতে পারোনি। হয়তো ওগুলো দেখলে পছন্দ হয়ে যাবে।'

কান খাড়া হয়ে গেছে নিনার। জিজ্ঞেস করল, 'আমি দেখলে অসুবিধে আছে?'

মনে মনে হাসল অনি। এটাই চাইছিল সে। নিরীহ ভঙ্গিতে বলল, 'তুমি দেখে আর কী করবে? পছন্দ তো করেই ফেলেছ।'

'করেছি। কিন্তু ছবিটা নেবই, তা তো বলিনি। নিয়েও ফেলিনি। চলো, গহনাগুলো দেখি আগে। তারপর ঠিক করব কোনটা নেব।'

মুসার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল অনি। নিনা ও জুলিয়াকে নিয়ে হাসিমুখে সেখান থেকে সরে গেল সে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'অনি তোমাকে চালাকি করে বাঁচিয়ে দিল। ছবির বদলে গহনাগুলো এখন নিনাকে পছন্দ করাতে পারলেই হয়।'

'যদি না পারে?' মুসার দুশ্চিন্তা যাচ্ছে না।

'তা হলে আর হবে না। কিনতে পারবে না। টাকাই জোগাড় হয়নি তোমার

এখনও।'

'সেটাই তো ভাবছি। কী করে যে জোগাড় করি টাকাটা!'

ঠিক এই সময় পেছন থেকে কথা বলে উঠল একটা মহিলা কণ্ঠ, 'খুব সুন্দর ছবি। ওটা আমি নেবই।'

পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল দুই গোয়েন্দা। বড় বড় ফুল আঁকা গাউন পরা সেই লাল চুলওয়ালা মহিলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। ব্যালেরিনা-ছবিটার দিকে উত্তেজিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছেন।

দমে গেল মুসা। বহু কষ্টে একজনকে বিদেয় করতে না করতেই আরেকজন এসে হাজির। বলল, 'সত্যি কিনবেন?'

'হ্যাঁ।'

'খুব পছন্দ হয়েছে আপনার?'

'হয়েছে। এত সুন্দর রঙ। আমার খুব কাজে লাগবে।'

কৌতূহল হলো কিশোরের। 'কি কাজ?'

'কোলাজ।'

'আর্টিস্ট নাকি আপনি?' জানতে চাইল কিশোর।

মাথা ঝাঁকালেন মহিলা। 'হ্যাঁ। আমি মিস ক্যারিনা হুপার । এখান থেকে দুই ব্লক পরে আমার একটা স্টুডিও আছে। কোলাজ আমার স্পেশালিটি। আমার পছন্দ। কোলাজ কি, জানো?'

'জানি। গত সপ্তায় স্কুলে আমাদেরকে কোলাজের কাজ শেখাচ্ছিলেন আমাদের আর্ট-টিচার,' কিশোর জানাল। 'একটা ম্যাগাজিন থেকে বেশ কিছু ছবি কেটে নিতে বললেন। তারপর একপাতা সাদা কাগজে সেগুলো আঠা দিয়ে সাঁটিয়ে ভিন্ন কোন চিত্র তৈরি করতে বললেন।'

'হ্যাঁ, এটাই কোলাজ। আর এ কাজই করি আমি। অন্যের আঁকা ছবি কেটে নিয়ে তার বিশেষ বিশেষ অংশ ক্যানভাসে জুড়ে নতুন ছবি তৈরি করি। এখানে দু'চারটা রঙের পোঁচ, ওখানে একটা টান, এ রকম করে এঁকে ছবিগুলোকে এমন করে মিশিয়ে দিই, খুব ভাল করে না তাকালে বোঝাই যাবে না যে ওগুলো জোড়া দেয়া।' ব্যালেরিনা-ছবিটার উপর ঝুঁকে দাঁড়ালেন ক্যারিনা। ভালমত দেখে নিয়ে মাথা দোলালেন, 'হুঁ, এ ছবিটাই আমার দরকার। নতুন যে কোলাজটা করছি আমি, তাতে খুব কাজে লাগবে।'

নীচের চোয়াল ঝুলে পড়ল মুসার। 'আপনি এত সুন্দর ছবিটা কেটে ফেলবেন? টুকুরো টুকরো করে ফেলবেন?'

সেখানে এসে দাঁড়ালেন সুট আর বো-টাই পরা সেই লম্বা ভদ্রলোক। 'আর্লি বার্ড'দের একজন। কিশোরের অচেনা।

'আমার নাম ডেভিড কারনারসন,' পরিচয় দিলেন তিনি। 'চিনবে। খবরের

কাগজে অ্যানটিক কলাম লিখি। রকি বীচ নিউজ।' ক্যারিনার দিকে ফিরলেন তিনি। 'আপনার জায়গায় আমি হলে ওই পচা ছবির পেছনে সময় নষ্ট করতাম না।'

সোজা হলেন ক্যারিনা। দ্বিধান্বিত মনে হলো তাঁকে। 'বুঝলাম না।'

'বোঝাই যাচ্ছে ছবিটা একজন সানডে পেইন্টারের আঁকা।'

'সানডে পেইন্টার মানে?' বুঝতে পারল না মুসা।

'সানডে পেইন্টার মানে জানো না? রবিবার হলো ছুটির দিন,' বুঝিয়ে দিলেন কারনারসন। 'কিছু কিছু শখের চিত্রকর আছে, যারা আর কোন কাজ না পেয়ে ছুটির দিনে বসে বসে ছবি আঁকে। তাদেরকে বলে সানডে পেইন্টার। যাই হোক, এ ছবিটা যে এঁকেছে সে একেবারেই নবিস। কিচ্ছু হয়নি। ব্রাশের কাজ মোটেও ভাল না। রঙ ব্যবহার করেছে ভুল। তবে গ্যারেজের ভেতর একটা ভাল ছবি দেখে এলাম। তেল রঙ। গ্রীক দেবী অ্যাথেনার একটা দুর্দান্ত ছবি। আমার মতে এ ছবিটার চেয়ে ওটা অনেক অনেক ভাল।'

'ও, তাই নাকি! দেখতে হয়।' খবরটা দেওয়ার জন্য কারনারসনকে ধন্যবাদ দিয়ে তাড়াহুড়া করে গ্যারেজের দিকে চলে গেলেন মহিলা।

'কিশোর! মুসা! আসবে একবার এদিকে?' ডাক দিলেন মিসেস রোজান। গাড়িপথের পাশের চত্বরে রাখা কতগুলো বাক্স সরাচ্ছেন তিনি। তাঁকে সাহায্য করছে রবিন।

'আসছি,' জবাব দিল কিশোর। মুসাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল সেদিকে।

চত্বরের দিকে এগোনোর সময় টিনা ডাউসনকে দেখা গেল। মন দিয়ে খুব আগ্রহের সঙ্গে লাভা ল্যাম্পটা দেখছে। ওদের চেয়ে বয়েসে বড়। এক ক্লাস উপরে পড়ে।

'কেমন আছো, টিনা?' পাশ কাটানোর সময় বলল কিশোর।

ফিরে তাকাল টিনা। 'অ, কিশোর। ভাল।' লাভা ল্যাম্পটা দেখিয়ে বলল, 'জিনিসটা খুব সুন্দর, না? আমার বেডরুমে ভাল মানাবে। বহু ঘ্যানর ঘ্যানর করে এতদিনে গিয়ে ঘরটা নতুন করে সাজিয়ে দিতে মাকে রাজি করিয়েছি। ষাটের দশকের থিম নেব আমি।'

'তারমানে ষাটের দশকে যে ভাবে ঘর সাজাত লোকে, সেভাবে সাজানো হবে?' মুসা বলল।

মাথা ঝাঁকাল টিনা। 'সুন্দর লাগবে না?'

'কি জানি, বুঝি না, হয়তো লাগবে। তবে পুরানোয় ফিরে যেতে আমার ভাল লাগে না।'

ব্যালেরিনা-পেইন্টিংটার কথা তুলল টিনা, 'ওটা মনে হয় খুব পছন্দ হয়েছে

তোমার? যেভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলে। কিনছ নাকি?'

'পারলে তো এখনই কিনে ফেলতাম,' গম্ভীর হয়ে গেল মুসা। 'কেনার জন্যে তো অস্থির হয়ে আছি। কিন্তু টাকা নেই।'

'কেন, কিছু আনোনি? ওগুলো বিক্রি হলেই টাকা জোগাড় হয়ে যাবে।'

'কখন হয় কে জানে। ছবিটা পছন্দ, এমন অনেকেই পকেটে নগদ টাকা নিয়ে ঘুরছে। বিক্রি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিনে ফেলবে।'

'তাই নাকি?' ভুরু কুঁচকাল টিনা। 'এত লোকের পছন্দ!'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল মুসা।

'চলি। টিনা, পরে কথা বলব। কাজ পড়ে আছে।' মুসার হাত ধরে টেনে নিয়ে দ্রুত আবার চত্বরের দিকে এগোল কিশোর। বাক্স সরানোর কাজে মিসেস রোজান ও রবিনকে সাহায্য করতে।

কাজ করতে করতে মাঝে মাঝেই চোখ তুলে তাকাচ্ছে কিশোর। 'আর্লি বার্ড'দের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। প্রচুর লোক আসছে গ্যারেজ সেল-এ। ভিড় বাড়ছে।

ব্যালেরিনা-ছবিটা যে টেবিলে, সেদিকে ফিরে তাকাল সে। এখনও আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন মিস্টার কারনারসন। ছবির দিকে নজর। তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে এলেন চোখের আরও কাছে, ভালমত দেখার জন্য।

'পচা ছবি' বলে মিস হুপারকে ওখান থেকে সরিয়েছেন কারনারসন। এখন তাঁর নিজেরই ওটার প্রতি এত মনোযোগ দেখে অবাক হলো কিশোর। চালাকি করেননি তো? অনি যেমন নিনাকে সরিয়েছে তিনিও হয়তো মিস হুপারকে সরিয়েছেন!

তিন

ব্যাপারটা মুসার চোখেও পড়ল। কিশোরকে বলল, 'দেখলে, সবাই যেন ওই ছবিটা কিনতেই এসেছে আজ। আমার আর কেনা হবে না। সামনের সপ্তার হাতখরচ থেকে অ্যাডভান্স নেব যে, তারও উপায় নেই। সিডি কেনার জন্যে আগেই নিয়ে ফেলেছি। এখন আরও চাইলে মা কোনমতেই দেবে না।'

ন'টা বাজতে দশ মিনিট বাকি। মিসেস রোজানকে গ্যারেজ গোছাতে সাহায্য করছে মুসা। গ্যারেজটা এখন ঝকঝকে তকতকে। আগে যতবার দেখেছে, জঞ্জাল আর আজেবাজে জিনিস স্তূপ হয়ে থাকত। মাকড়সার জাল, ধুলোবালির তো

ছড়াছড়ি ছিল। এখন গ্যারেজ সেলের জন্য ধুয়েমুছে সাফ করা হয়েছে। টেবিলে টেবিলে পণ্য সাজানো। কিন্তু এসবে মন নেই তার মন পড়ে আছে ছবিটার দিকে। টাকা জোগাড়ের কথা ভাবতে ভাবতে গরম করে ফেলছে মাথা। কোন কূল-কিনারা করতে পারছে না।

সুন্দর একটা কাঁচের নীল ফুলদানিতে স্টিকার লাগাচ্ছে কিশোর। তাতে লাল লাল ফোঁটা। মুসার মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া হলো তার। বলল, 'ব্যালেরিনা-পেইন্টিংটা সরিয়ে রাখতে বলব অনির আম্মাকে। তোমার পুতুল আর সিডিগুলো বিক্রি হয়ে গেলে কিনে নিয়ো।'

জোরে নিঃশ্বাস ফেলে মুসা বলল, 'বলা কি আর বাকি রেখেছি? তিনি বললেন, কাজটা ঠিক হবে না। আমার জিনিসগুলো বিক্রি না হলে টাকাও পাব না; ছবিটাও কিনতে পারব না। অন্য কারও কাছে বিক্রি করারও সময় থাকবে না তখন। ছবিটা ফিরিয়ে দিতে হবে। ছবির মালিকের প্রতি অবিচার করা হবে।'

'তা ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। পকেটে হাত দিল সে। 'আমার কাছে মাত্র এক ডলার আছে। তোমাকে দিতে পারি। তোমার দুই ডলার নিয়ে তা হলে তিন ডলার হবে। কিন্তু তাতে কোনই লাভ নেই। আরও সাত ডলার জোগাড় করতে হবে তোমাকে...'

উত্তেজিত ভঙ্গিতে রবিনকে গ্যারেজে ঢুকতে দেখে চুপ হয়ে গেল সে।

কাছে এসে দাঁড়াল রবিন।

'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কিশোর! ছবিটা কই?'

'ছবিটা কই মানে?'

'অন্য কোথাও সরিয়ে রেখেছ নাকি?'

'কোন ছবি? কোথায় রাখব?' বুঝতে পারল না কিশোর।

'কীসের কথা বলছ তুমি?' মুসার প্রশ্ন।

'আরে ওই যে ওটা, ব্যালেরিনা-পেইন্টিং!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রবিন। 'টেবিলে নেই!'

'নেই মানে!' চিৎকার করে উঠল মুসা।

'নেই মানে নেই,' জবাব দিল রবিন। 'ওই টেবিলেই তো ছিল। তোমরা না সরালে কোথায় গেল?'

'আমরা সরাইনি। যাবে কোথায়!' বলতে বলতে গ্যারেজের দরজার দিকে দৌড় দিল কিশোর।

টেবিলটার কাছে এসে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। সত্যিই নেই ছবিটা।

'কেউ সরিয়েছে!' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর।

'কে সরাল?' এদিক ওদিক তাকাতে লাগল মুসা। 'মাটিতে পড়েনি তো?'

পরের কয়েকটা মিনিট পুরো চত্বর চষে বেড়াল তিন গোয়েন্দা। যতগুলো টেবিল আছে, সবগুলোর ওপরে-নীচে ভালমত দেখল। খালি বাক্সগুলোর মধ্যে খুঁজল। অন্যান্য ছবিগুলোর পেছনে আছে কিনা, তা-ও দেখল কিন্তু নেই। কোথাও পাওয়া গেল না ব্যালেরিনা-ছবিটা।

রোজানদের বাড়ির চত্বরে এখন প্রচুর ভিড়।

নিজের ঘড়িটা আনতে ভুলে গেছে কিশোর। আরেকজনের একটা ঘড়ির দিকে তাকাল। ন'টা বাজতে আর মাত্র দুই মিনিট বাকি। দুই মিনিট পরেই বিক্রি শুরু হবে।

এ সময় সেখানে এসে হাজির হলেন মিসেস রোজান। এক হাতে ক্লিপবোর্ড, আরেক হাতে একটা ক্যাশ বাক্স–জিনিস বিক্রির টাকা রাখবার জন্য। ছেলেদের বললেন, 'সময় হয়ে গেছে। মুসা, রবিন, তোমরা দু'জন আমার সঙ্গে এসো। খদ্দেরদের কাছ থেকে টাকা বুঝে নিয়ে রশিদ দিতে আমাকে সাহায্য করবে। কিশোর, তুমি অনির কাছে যাও। ওকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরবে। কাস্টোমারদের ওপর নজর রাখবে। কেউ কিছু জানতে চাইলে জানাবে। পারবে না?'

'পারব,' কিশোর বলল। 'আন্টি, ছবিটা কি অন্য কোথাও সরিয়ে রেখেছেন?'

'কোন ছবি?'

'ওই তো, ব্যালেরিনা-পেইন্টিংটা। মুসা যেটা কেনার জন্যে অস্থির হয়ে আছে।'

'না তো!' ভুরু কুঁচকে ফেললেন মিসেস রোজান। 'আমি সরাতে যাব কেন?' ঠিক এই সময় একজন মহিলাকে পাশ কাটাতে দেখে তার দিকে ছুটে গেলেন তিনি, 'জুডিথ! এই জুডিথ! শোনো শোনো, তোমার সঙ্গে কথা আছে। ওই যে এক বাক্স এনসাইক্লোপীডিয়া রেখে গেলে না, ওগুলোর ব্যাপারে।'

কিশোরের দিকে ফিরল মুসা। চোখে হতাশা। বলল, 'আন্টিও সরাননি। তা হলে কে সরাল? কি হলো ছবিটার?'

'চুরি করেনি তো কেউ?' রবিন বলল।

'চুরি! কে করবে? কেন করবে?'

'চলো, চলো, কাজে যাই,' তাগাদা দিল কিশোর। 'ছবির কথা পরেও ভাবা যাবে।' দুই সহকারীকে বলল, 'তোমরা তোমাদের কাজ করোগে। আমি আর অনি কাস্টোমারদের ওপর নজর রাখার ফাঁকে ফাঁকে আরেকবার খুঁজে দেখব। চিন্তা কোরো না। বের করে ফেলব।'

কিশোরের উপর অগাধ আস্থা মুসার। কিশোর যখন বলেছে বের করে ফেলবে, সত্যিই করে ফেলবে। বলল, 'ঠিক আছে। কিন্তু নতুন আর কোথায় খুঁজবে? খোঁজা তো কোথাও বাকি রাখিনি আমরা!'

'দেখা যাক।'

চার

একটা টেবিলে কতগুলো পুরানো বই গোছাচ্ছে অনি। সেখানে এসে ছবিটা নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার কথা অনিকে জানাল কিশোর। তারপর বলল, 'আমাদের দু'জনকে ঘুরে বেড়াতে বলেছেন আন্টি। কাস্টোমারদের ওপর নজর রাখতে বলেছেন। ভালই হলো। ঘুরে বেড়ানোর ছুতোয় ছবিটা খুঁজতে পারব আমরা।

'দু'জনে একসাথে না থেকে অলাদা হয়ে গেলেই পারি। দু'জন দু'দিকে গেলে খুঁজতে সুবিধে হবে,' অনি বলল। 'হারানো জিনিস তো এভাবেই খোঁজে গোয়েন্দারা, তাই না?'

হেসে ফেলল কিশোর। 'সেটা অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে। সব সময়ই যে খোঁজার সময় আলাদা হয়ে যেতে হবে, এমন কো কথা নেই। তবে, এখন দু'জন দু'দিকে যাওয়াটাই ঠিক হবে। তুমি খোঁজোগে ড্রাইভওয়েতে আর গ্যারেজে। আমি যাচ্ছি সামনের চত্বরে।'

তাড়াহুড়া করল না কিশোর। ধীরে সুস্থে টহল দিতে লাগল পুরো চত্বরটায়। একবার খোঁজা হয়ে গেছে এদিকটায়। মুসা আর রবিনকে সঙ্গে নিয়ে খুঁজেছে। কোথায় কোথায় বাদ পড়েছে মনে করে দেখল। পুরানো আমলের কতগুলো পালকের বালিশ পড়ে থাকতে দেখল এক জায়গায়। ওখানে খোঁজা হয়নি। প্রতিটি বালিশ উল্টে তার নীচে দেখল সে। আরেক জায়গায় ঝোলানো কিছু মখমলের পোশাক দেখে সেগুলোর ফাঁকে ফাঁকেও খুঁজে দেখে এল।

সব দেখা হয়ে গেল। আর কোন খুঁজবার জায়গা নেই। লোকের হাতের দিকে তাকাতে লাগল তখন। ছবিটা কারও হাতে আছে কিনা দেখল। তা-ও নেই।

'এই, কিশোর!'

ডাক শুনে ফিরে তাকাল কিশোর। নিনা ডাকছে। ওর এক হাতে গোটা দুই সিডি আর আরেক হাতে একটা চুলের কাঁটা। প্রজাপতির মত ডানা আছে কাঁটাটার। রঙিন কাঁচ দিয়ে তৈরি।

এগিয়ে গেল কিশোর। 'কি?'

'না, এমনি ডাকলাম। কি করছ?'

'এই তো, ঘোরাফেরা করছি।' কাঁটাটার কথা জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'কিনলে নাকি? ওটাই পছন্দ হলো শেষমেষ?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকি দিল নিনা। কাঁধের উপরের বাদামী চুলগুলো নেচে উঠল

ঝাঁকি লেগে। 'ছবিটাই কিনতে চেয়েছিলাম। কিন্তু খুঁজে পেলাম না কোথাও। কে কিনেছে, জানো নাকি?'

একটু ইতস্তত করে জবাব দিল কিশোর, 'না। আসলে যা মনে হচ্ছে, ওটা হারিয়ে গেছে।'

'হারিয়ে গেছে!' হাসতে শুরু করল নিনা। 'যে যে কাজের লোক নয়, তাকে দিয়ে সেটা হয় না। তোমরা হলে গোয়েন্দা। আর তোমাদের বানানো হয়েছে মেলার পাহারাদার। জিনিসপত্র কীভাবে দেখে রাখতে হয় জানো না। হারিয়েছে তো সেজন্যেই।'

নিনার কথা গায়ে মাখল না কিশোর। 'তারমানে, তুমিও দেখোনি ছবিটা?'

কিশোরের দিকে বাঁকা চোখে তাকাল নিনা। 'দেখিনি মানে? কি বলতে চাও?'

'না, কিছু ভেবে বলিনি। এমনি, কথার কথা।'

'তোমাদের সামনেই তো তখন দেখেছি। এরপর আর যাইইনি ওদিকে, দেখব কি করে?'

আর কিছু না বলে চলে গেল নিনা। মুসারা যেদিকে কাজ করছে।

নিনার আচরণে অবাকই হলো কিশোর। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে তাকিয়ে থেকে ঘুরে দাঁড়াল। কয়েক গজ দূরে ফেলে রাখা একটা মলাটের বাক্স দেখে সেটার দিকে এগোল। ওটার ভিতরে ছবিটা আছে কিনা দেখবার জন্য সবে ঝুঁকেছে, কনুইয়ে হাত পড়তে ঘুরে তাকাল।

মিস ক্যারিনা হুপার দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে একটা ছবি। গ্রীক দেবী অ্যাথিনার। জিজ্ঞেস করলেন 'এই, ব্যালেরিনা-ছবিটা কোথায় দেখেছ তুমি?' অ্যাথিনার ছবিটার দিকে কিশোরকে তাকাতে দেখে বললেন, 'এটাও দরকার হবে আমার কোলাজে। ব্যালেরিনাটাও দরকার।' কিশোরের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচালেন। 'কই, বললে না? ছবিটা কোথায়?'

'ছবিটা আমরাও খুঁজে পাচ্ছি না!'

দুই ভুরু উঁচু হয়ে গেল মহিলার। 'খুঁজে পাচ্ছ না মানে? কোথায় গেল?'

'কোথায় গেল কে জানে!' বাঁকা চোখে মহিলার দিকে তাকাল কিশোর। 'হারিয়ে গেছে...চুরিও হতে পারে।'

'না, চুরি করবে কে?' অস্বস্তি বোধ করছেন মনে হলো মিসেস হুপার। 'ছবিটা পেলে ভাল হতো। যাকগে, ওটা পাওয়া গেলে আমাকে জানিয়ো।'

'আচ্ছা।'

মহিলা চলে যাওয়ার পরেও দীর্ঘ একটা মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল ওখানে কিশোর। নীচের ঠোঁটে ঘন ঘন চিমটি কাটল দু'তিন বার। তারপর এগোল একটা টেবিলের দিকে। বাড়ির লোকের জন্য ওটাতে কিছু খাবার আর ড্রিংকস রাখা আছে।

কমলার রসের বোতল থেকে এক কাপ রস ঢেলে নিয়ে চুমুক দিল সে। মগজে ভাবনার ঝড়। কি হলো ব্যালেরিনা-ছবিটার? সত্যি কি চুরি হয়েছে? কে চুরি করল?

খাওয়া শেষ করে আবার পা বাড়াল কিশোর। একটা মেয়েকে দেখল ওর পারকাটা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখছে। মেয়েটাকে চেনে সে। ওদের স্কুলেই পড়ে। আগ্রহ দেখে মনে হলো, পারকাটা কিনতে পারে মেয়েটা। মনে মনে খুশি হলো কিশোর। পারকাটা বিক্রি হয়ে গেলে টাকা পাবে। 'কে' অক্ষর খোদাই করা কলমটা কিনতে পারবে তা হলে।

আরেকটা টেবিলের সামনে মিস্টার ডেভিড কারনারসনকে দেখতে পেল। পুরানো একটা রূপার পকেট ঘড়ি দেখতে দেখতে পাশে দাঁড়ানো একজন মহিলার সঙ্গে কথা বলছেন তিনি। মহিলাকে চেনে সে। রোজানদের পাশের বাড়িটাই তাঁদের।

কি আলোচনা হচ্ছে শুনবার জন্য এগিয়ে গেল কিশোর। সাধারণ সময় হলে যেত না। কিন্তু এখন ছবিটার কথা কিছু বলছেন কিনা, শুনবার কৌতূহল সামলাতে পারল না।

'গ্যারেজ সেলে যে সব জিনিস বিক্রি হয়, আপাত দৃষ্টিতে সে-সবকে খুবই তুচ্ছ আর অল্প দামী মনে হলেও অনেক সময় এমন দামী দামী সব জিনিস বেরিয়ে পড়ে, চমকে যেতে হয়,' কারনারসন বলছেন। 'যেমন ধরুন, পেনসিলভ্যানিয়ায় একবার এক গ্যারেজ সেলে একটা পাথর বসানো চুলের কাঁটা পাওয়া গিয়েছিল, মাত্র দু'ডলার দিয়ে কিনেছিল একজন। পরে দেখা গেল, পাথরটা কাঁচ কিংবা অন্য কিছু না, একেবারে আসল হীরা। আরেকবার ক্যালিফোর্নিয়ায় একটা ছবি বিক্রি হয়েছিল বিশ ডলারে। পরে জানা গেল ওটা এতই দামী, নিউ ইয়র্কে নিলামে বিক্রি হয়েছিল দশ লক্ষ ডলারে।'

চমকে গেল মহিলা। 'দশ লক্ষ ডলার! এত টাকা! তা হলে তো অন্য কিছু না খুঁজে এখন শুধু ছবি খুঁজে বেড়ানোই উচিত। বলা যায় না, আমিও ও রকম দামী একটা ছবি পেয়ে যেতে পারি।'

হাসলেন কারনারসন। 'সব সময় তো আর এ রকম ঘটে না। আর এর জন্যে ভাগ্যও দরকার। বিরাট ভাগ্য। এ সব কথা বহুবার আমি লিখেছি আমার কলামে। গত সপ্তায়ই তো একটা আরটিকল লিখলাম। আপনি তো আমার কলামটা পড়েন। পড়েন না?'

কারনারসনের কথা শুনে অন্য ভাবনা মাথায় ঢুকল কিশোরের। শেষবার ওই ভদ্রলোকের হাতেই ছবিটা দেখা গেছে, মনে আছে তার। ছবিটার ব্যাপারে তিনি হয়তো কোন সূত্র দিতে পারবেন।

জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু এ সময় এমন একটা দৃশ্য চোখে পড়ল

তার, নজর চলে গেলে সেদিকেই

গাড়িপথের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে দেখল নিনাকে। বগলে চেপে ধরে রেখেছে ময়লা ফেলবার একটা কালো ব্যাগ। ভিতরে বড়সড় কোনো জিনিস রয়েছে।

ছবিটা না তো? নিজেকেই প্রশ্ন করল কিশোর। ব্যালেরিনা-পেইন্টিং!

পাঁচ

এখনই ধরা দরকার। কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা দৌড় লাগাল কিশোর। কিন্তু তার চেয়ে অনেকখানি এগিয়ে রয়েছে নিনা। ধরতে সময় লাগবে।

'নিনা! নিনা!' বলে চেঁচিয়ে ডাকতে ডাকতে ছুটছে কিশোর। হাত নেড়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে।

লাভ হলো না। হয় তার ডাক শুনল না নিনা, কিংবা শুনলেও পাত্তা দিল না। ইচ্ছে করে ফিরে তাকাল না।

কিশোরের চোখ নিনার দিকে। দৌড়ানোর সময় নীচের দিকে তাকানোর সুযোগ পাচ্ছে না। হঠাৎ কীসে পা বেধে উড়ে গিয়ে পড়ল মাটিতে। ভাগ্যিস ঘাসের উপর পড়েছে। নইলে হাঁটু, কনুই সব ছিলে যেত। ঘাসের উপর এক গড়ান দিয়ে উঠে বসল সে। কনুই ডলতে ডলতে ফিরে তাকাল কীসে পা বেধেছে দেখার জন্য।

পেছনে ঘাসের উপর একটা ভারী বাক্স পড়ে থাকতে দেখল। ভিতরে সিডি ছিল একগাদা। লাথি লেগে বাক্স থেকে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে অনেকগুলো সিডি।

'বাহ্, চমৎকার! কাজ বাড়ল!' আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর। প্রচণ্ড বিরক্ত। মুখ ঘুরিয়ে ফিরে তাকাল নিনার দিকে। কিন্তু দেখতে পেল না ওকে। বেরিয়ে চলে গেছে।

পিছু নেবে? লাভ হবে না, বুঝে গেছে কিশোর। অকারণ আর নিনার পেছনে না ছুটে সিডি গোছানোয় মন দিল সে। সিডিগুলো তুলে নিয়ে আবার বাক্সে ভরতে শুরু করল।

পাঁচ মিনিট পরে সামনের চত্বরে এসে দাঁড়াল সে, যেখানে কাজে ব্যস্ত মিসেস রোজান, মুসা ও রবিন। মিসেস রোজান এক মহিলার হাত থেকে টাকা নিচ্ছেন। রবিন রশিদ লিখছে। মুসা একটা আপেল খাচ্ছে। এক কামড় দিয়েছে সবে আপেলটায়। বাকিটা কিশোরের দিকে তুলে জিজ্ঞেস করল, 'খাবে?'

'না!' মাথা নাড়ল কিশোর। 'একটা কথা জানতে এলাম। নিনার কাছে একটু আগে কোন জিনিস বিক্রি করেছ তোমরা?'

ফিরে তাকালেন মিসেস রোজান। জবাবটা তিনিই দিলেন, 'নিনা হাওয়ার্ড? না তো।'

'বড়, চ্যাপ্টা কোন জিনিস?'

'উঁহু। আচ্ছা, দাঁড়াও, দেখে নিই। এত ঝামেলার মধ্যে খেয়ালও না থাকতে পারে।' রশিদের কার্বন কপিগুলো উল্টে দেখলেন মিসেস রোজান। 'না। ভুলিনি। নিনার নামে কোন রশিদ নেই এখানে।'

কয়েকজন খরিদ্দার একসঙ্গে এসে দাঁড়াল এ সময়। সবার হাতেই কিছু না কিছু জিনিস। সেগুলোর দাম দিতে এসেছে। টাকা বুঝে নিয়ে রশিদ দেওয়ায় ব্যস্ত হলেন মিসেস রোজান, রবিন ও মুসা। আপাতত কথা বলবার আর সুযোগ নেই। সেখান থেকে সরে চলে এল কিশোর।

মেলার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল আবার সে। তার মগজের বেয়ারিংগুলো বনবন করে ঘুরছে। এই 'বেয়ারিং ঘোরা' কথাটা মুসার আবিষ্কার। এর মানে হলো 'অতিরিক্ত মাথা খাটাচ্ছে' গোয়েন্দাপ্রধান। মগজের বেয়ারিং থাকে না। কিন্তু মুসা যখন বলে, সেটা মানিয়ে যায়।

কিশোর ভাবছে, নিনা যদি কিছু না-ই কিনে থাকে, তা হলে কালো ব্যাগে ভরে ওটা কি নিয়ে গেল? সাইজ দেখে তো ছবি ছাড়া আর কিছু মনে হলো না।

ব্যালেরিনা-পেইন্টিং!

নিনাকে চোর ভাবতে ভাল লাগল না তার। কিন্তু চোখের সামনে যা দেখল, তাতে সন্দেহ না করেও থাকতে পারছে না।

ছয়

'বাপরে, কত টাকা!' চিৎকার করে উঠল অনি। আনন্দের আতিশয্যে এক গাদা নোট উপর দিকে তুলে নাচাতে শুরু করল সে। 'পাঁচশো সাতাশি ডলার! এত টাকা একসঙ্গে জীবনে চোখেও দেখিনি।'

পাঁচটা বাজে। মেলার শেষ ক্রেতাটিও বেরিয়ে গেছে মিনিটখানেক আগে। টাকাগুলো মায়ের হাতে দিল অনি। মিসেস রোজান ক্যাশ বাক্সে ভরে রাখলেন। তারপর রশিদের কপিগুলো নিয়ে হিসাব মেলাতে বসলেন। যে সব জিনিস বিক্রি হয়নি, সেগুলো আবার বাক্সে ভরতে শুরু করল তিন গোয়েন্দা।

সূর্য ডোবেনি এখনও। রোদ ঝলমল করছে। বছরের এ সময়টায় সূর্য বেশ

দেরি করেই ডোবে। কাজ করতে করতে মাঝে মাঝেই চোখ তুলে তাকাচ্ছে কিশোর। সুন্দর একটা বাগান আছে রোজানদের। নানা রকম ফুল ফুটে আছে। ড্যাফোডিল, টিউলিপ, আরও কত কি। সবই সুন্দর। কোন কোনটার তো চোখ ধাঁধানো রঙ। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল সে। কাজ করতে করতে গরম হয়ে গেছে শরীর। ঘেমে গেছে। সারা দিন খেটেছে। চরকির মত পাক খেয়েছে। ক্লান্তি লাগছে এখন।

ক্যালকুলেটর বের করে বোতাম টিপে যাচ্ছেন মিসেস রোজান। ভুরু কুঁচকানো দেখে বোঝা যাচ্ছে কোন সমস্যায় পড়েছেন। 'আশ্চর্য! তিনশো দশ ডলার আছে আমাদের হাতে, ঠিক?' যেন নিজেকেই করলেন প্রশ্নটা। 'কিন্তু রশিদ আছে তিনশো ডলারের।'

'দেখি তো?' টাকাগুলো আবার ভালমত গুনে দেখল অনি। 'তিনশো দশ ডলারই আছে। একটা টাকাও কম নয়।'

'তারমানে কোন একজনকে রশিদ দিতে ভুলে গেছি,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন মিসেস রোজান। 'দু'জনও হতে পারে। রশিদ নেয়নি ঠিক আছে, কিন্তু টাকা বাড়তি হবে কেন? এমনও তো হতে পারে, ভাঙতি দেয়ার সময় কাউকে ভুলে কম দিয়ে ফেলেছি। সে-ও নেয়ার সময় খেয়াল করেনি, আমরাও দিতে ভুল করে ফেলেছি।'

ওদের সব কথাই কানে আসছে কিশোরের। টাকার অঙ্কটা সতর্ক করে তুলল তাকে।

সাত

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। 'তারমানে তোমার ধারণা, নিনাই আমার ব্যালেরিনা-ছবিটা চুরি করেছে?'

রোজানদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা নিনাদের বাড়ির দিকে এগোচ্ছে তিন গোয়েন্দা। কথা বলতে বলতে হাঁটছে ওরা। দুই সহকারীকে সব খুলে বলেছে কিশোর। কীভাবে কালো ব্যাগে ভরা বড় চ্যাপ্টা একটা জিনিস বগলে চেপে নিয়ে যাচ্ছিল নিনা, কীভাবে ওর পিছু নিতে গিয়ে সিড়ির বাক্সে আছাড় খেয়েছে, সব। সেজন্যই ওদের বাড়িতে যাচ্ছে এখন। নিনাকে গিয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করবে।

'জানি না,' মুসার প্রশ্নের জবাবে বলল কিশোর। 'চুরি করতেও পারে। ছবিটা ওর ঘরে সাজানোর জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিল নিনা। অন্য জিনিস কিনে টাকা খরচ করে ফেলেছে। প্রতিযোগিতা এড়াতে চুরির চেয়ে সহজ উপায় আর ছিল

না।

'কীসের প্রতিযোগিতা?' বুঝতে পারল না রবিন।

'বুঝলে না? প্রথমেই ধরো মুসার কথা,' জবাব দিল কিশোর। 'সে-ও খেপে উঠেছিল ছবিটার জন্যে। তারপর, মিস ক্যারিনা হুপার। তিনিও কিনতে চেয়েছিলেন। দেখলে হয়তো আরও অনেকেই কিনতে চাইত।'

নিনাদের বাড়িতে পৌঁছল ওরা। দরজায় টোকা দিল কিশোর। জবাব পেল না।

'বেল বাজাও না, তা হলেই তো হয়,' রবিন বলল।

ডোরবেল বাজাল কিশোর। একবার। দু'বার। তিনবার। কারও কোন সাড়াশব্দ নেই।

'বাড়িতে কেউ নেই মনে হচ্ছে,' হতাশ কণ্ঠে বলল সে।

কিশোরের চেয়ে বেশি হতাশ হলো মুসা।

'কি আর করা। চলো, ফিরে যাই,' কিশোর বলল।

'চলো,' মাথা কাত করল রবিন।

ফেরার পথে চুপচাপ রইল কিশোর। কী যেন ভাবছে। আচমকা দাঁড়িয়ে গেল। বিড়বিড় করে বলল, 'দশ ডলার!'

অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল দুই সহকারী গোয়েন্দা।

'দশ ডলার মানে?' রবিনের প্রশ্ন।

'ছবিটার দাম। ব্যালেরিনা-ছবিটার দাম ধরা হয়েছিল দশ ডলার।'

প্রায় চোখ উল্টে দিয়ে মুসা বলল, 'এই তো শুরু হলো তোমার গ্রীক ভাষা। দশ ডলার যে দাম, সেটা কি আমরা জানি না?'

জোরে মাথা নেড়ে কিশোর বলল, 'না, আমি সেকথা বলছি না। জানি তো বটেই। আমি ভাবছি মিসেস রোজানের কথা। তিনি দেখলেন না কেন?'

'আরে কী যা তা বলছ? কী দেখলেন না মিসেস রোজান?' অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল মুসা।

'আমি যা বলি মন দিয়ে শোনো। শুনে, ভাবো। দেখো, কিছু বুঝতে পারো কিনা। ধরা যাক, নিনা কিংবা অন্য কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে ছবিটা। তারপর কোন এক ফাঁকে ক্যাশ বাক্সে দশটা ডলার ঢুকিয়ে রেখে গেছে। রশিদ নেয়নি।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'জিনিসও নিয়েছে, টাকাও দিয়েছে, সুতরাং ব্যাপারটা আর চুরি থাকল না—এ রকমই চিন্তা করেছে সে...'

রবিনের কথা শেষ হওয়ার আগেই হঠাৎ কপাল চাপড়ে বলে উঠল মুসা, 'এহ্‌হে, আসল কথাটাই ভুলে বসে আছি। বলা উচিত ছিল আরও আগেই।'

'কী কথা?' মুসার বলার ভঙ্গি কৌতূহল বাড়িয়ে দিল কিশোরের।

'ওই ভদ্রলোক, মিস্টার কারনারসন...কী কারনারসন যেন?'

'ডেভিড কারনারসন,' মনে করিয়ে দিল কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'হ্যাঁ, ডেভিড কারনারসন। ছবিটা ভাল না, এর কোন দাম নেই, এসব বলে বলে তো মিস ক্যারিনা হুপারকে সরালেন। তারপর কি করেছেন জানো? ছবিটাকে ভালমত দেখতে লাগলেন। দামী জিনিসের মত।'

'আমিও দেখেছি,' কিশোর বলল।

'তুমি কি তাঁকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে ছবিটা পরীক্ষা করতে দেখেছ?' ভুরু নাচিয়ে কিশোরকে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'না!' অবাক হলো কিশোর।

'গ্লাস দিয়ে ছবিটার প্রতিটি ইঞ্চি খুঁটিয়ে দেখেছেন তিনি। কী যেন বোঝার চেষ্টা করেছেন। ভঙ্গি দেখে তখন মনে হচ্ছিল, ছবিটা বুঝি কিনেই ফেলবেন। ক্যারিনা হুপারকে বিদেয় করে দিয়ে ছবিটার প্রতি তাঁর এই আগ্রহ কেমন সন্দেহ জাগায় না?'

চুপ করে ভাবছে কিশোর। মিস্টার কারনারসন কি কোন তথ্য লুকিয়েছেন? ছবিটাকে তিনি সাধারণ বললেও আসলে অনেক দামী না তো? চুরিটা কি তিনিই করেছেন, আর অকারণে নিনাকে সন্দেহ করছে ওরা?

আট

পনিরের বাটিটা টেনে নিল কিশোর। এক টুকরো পাঁউরুটি তুলে নিয়ে তাতে মাখন মাখানো শুরু করল।

চাচা-চাচীর সঙ্গে রাতে খেতে বসেছে সে। রান্না হয়নি আজ। মেরিচাচী বাড়ি ছিলেন না। জরুরী কাছে বেরিয়েছিলেন। একটু আগে ফিরেছেন। বাজার থেকে কিনে আনা খাবার দিয়ে রাতের খাওয়া সারতে হবে।

খাবার নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই কিশোরের। পেলেই হলো। সেটা নিজেদের বাড়ির রান্নাই হোক, কিংবা বাইরে থেকে কিনে আনাই হোক।

কিশোরের চাচা রাশেদ পাশা রুটিতে মাখন না মাখিয়ে বরং দইয়ের বাটিটা টেনে নিলেন। ঘরে পাতা দই। ফ্রিজ থেকে বের করেছেন। নিজের হাতে দই পাতেন তিনি। টক দইয়ের সঙ্গে খুব সামান্য চিনি আর লবণ মিশিয়ে খেতে পছন্দ করেন। রুটির টুকরোতে একটা করে কামড় দিয়ে চামচে করে এক চামচ দই তুলে তুলে মুখে পুরতে লাগলেন।

রুটির প্রথম টুকরোটা মাখন আর জেলি দিয়ে খেল কিশোর। দ্বিতীয় টুকরোটা খাওয়ার সময় মুরগীর ফ্রাই করা রান তুলে নিল একটা। সেই সাথে টক দই, লেটুস, টমেটো আর পেঁয়াজ-মরিচ দিয়ে খুব ঝাল করে বানানো সালাদ।

এটাও রাশেদ পাশার তৈরি।

'কি রে, কিশোর, খেয়েই যাচ্ছিস আজ!' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন রাশেদ পাশা। 'কী হয়েছে তোর?'

'কি আর হবে,' চাচী বললেন। 'গ্যারেজ সেলে গিয়েছিল সারাদিন খাটাখাটনি করেছে। খিদে তো পাবেই।'

'উঁহুঁ!' মাথা নাড়লেন চাচা, 'আমার তা মনে হয় না। ওকে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। নিজের অজান্তেই খেয়ে যাচ্ছে ও।'

এতক্ষণে যেন বাস্তবে ফিরে এল কিশোর। রুটির টুকরোতে কামড় বসাতে গিয়েও বসাল না। চাচার দিকে তাকাল। 'ঠিকই বলেছ, চাচা। নতুন একটা রহস্য পেয়েছি। সেটার কথাই ভাবছিলাম।'

বিশাল গোঁফের নীচে হাসি ছড়িয়ে পড়ল রাশেদ পাশার। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচালেন। 'কি, বলেছিলাম না? আমি ওকে চিনি না মনে করেছ। ও হলো রহস্য-চুম্বক। আর রহস্যগুলো লোহার টুকরো। চুম্বকের আকর্ষণে যেমন লোহার গুঁড়ো লাফ দিয়ে এসে গায়ে পড়ে, রহস্যও যেন ওকে দেখলেই ছুটে আসে।'

'হুঁ!' চাচী বললেন।

'কী রহস্য পেলি?' ভাতিজাকে জিজ্ঞেস করলেন রাশেদ পাশা।

হাতের আধখাওয়া রুটির টুকরোটা নামিয়ে রেখে ন্যাপকিন তুলে নিল কিশোর।

'ওটুকু আর রাখলি কেন?' চাচী বললেন। 'খেয়ে ফেল।'

'পারব না। পেটে আর জায়গা নেই।' ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছে ব্যালেরিনা-ছবিটার কথা সব চাচা-চাচীকে খুলে বলল কিশোর।

মন দিয়ে সব শুনলেন রাশেদ পাশা। কিশোরের কথা শেষ হলে গোঁফের এক কোণ মুচড়ে ধরে মাথা দোলালেন। 'হুঁ, ইন্টারেস্টিং কেস। তুই কাকে সন্দেহ করিস?'

'এখন পর্যন্ত আমার প্রধান সন্দেহ নিনাকে। মুসার পরে ছবিটা প্রথমে ওর চোখেই পড়ে। পকেটে টাকা ছিল। কিনতেও চেয়েছিল। কিন্তু অন্য জিনিস কিনে টাকাটা খরচ করে ফেলার পর চুরি করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না ওর। ছবির মত একটা জিনিস কালো ব্যাগে ভরে নিয়ে চলে যেতেও দেখেছি ওকে।'

'ব্যাগের মধ্যে অন্য জিনিসও তো থাকতে পারে,' চাচী বললেন।

'তা পারে,' নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে ছেড়ে দিল কিশোর। 'কিন্তু প্যাকেটটা দেখে ছবি ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি। চ্যাপ্টা। সাইজটাও ব্যালেরিনা-ছবিটার মত। যাই হোক, আমার দ্বিতীয় সন্দেহ মিস্টার কারনারসনকে।'

'কোন কারনারসন?' চাচী জানতে চাইলেন।

'তুমি কোন কারনারসনের কথা ভাবছ?'

'ডেভিড কারনারসন,' চাচী বললেন। 'অ্যান্টিকের ওপর কলাম লেখেন যিনি। তাঁর লেখা আমার খুব ভাল লাগে।'

'এত লোক থাকতে তাঁর কথা তোমার মাথায় এল কেন?'

'গ্যারেজ সেলের কথা শুনলেই সেখানে দৌড় দেন তিনি। পত্রিকায় লেখার মালমশলা জোগাড়ের জন্যে। সেজন্যেই আমার মনে হলো ওই কারনারসনই হবেন।'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ভদ্রলোককে চেনো তুমি? পরিচয় আছে নাকি?'

'আছে,' চাচী জবাব দিলেন। 'একটা অনেক পুরানো ম্যাপ ছিল আমার কাছে। আমার দাদার জিনিস। কিছুদিন আগে বাক্স ঘাঁটতে গিয়ে ম্যাপটা পেয়ে গেলাম। মিস্টার কারনারসনের কলাম পড়ি তো, মনে হলো, ম্যাপটা তাঁর কাছে নিয়ে যাই। তিনি হয়তো বলতে পারবেন, এটার কোন অ্যানটিক মূল্য আছে কিনা। দেখেটেখে বলে দিলেন তিনি, ততটা নেই, তবে ভাল দামে বিক্রি করা যাবে। তিনশো ডলার, কিংবা তারও বেশি। ম্যাপটা অবশ্য আমি বিক্রি করিনি। রেখে দিয়েছি। থাক, দাদার স্মৃতি।'

কিশোরের দিকে তাকালেন রাশেদ পাশা। 'ভদ্রলোককে ভালই তো মনে হচ্ছে আমার। কিন্তু হঠাৎ করে তাঁকে সন্দেহ হলো কেন তোর?'

'হঠাৎ করে হয়নি,' জবাব দিল কিশোর।

'তাহলে? ভদ্রলোককে আমিও চিনি। খুব সম্মানী লোক। শুধু সাংবাদিকই নন, অনেক বড় অ্যানটিক স্পেশালিস্ট।'

'সে তো চাচীর কথা শুনেই বুঝলাম।'

'তাহলে তাঁকে সন্দেহ করতে গেলি কেন?'

প্লেটে ফেলে রাখা ওর আধখাওয়া রুটির টুকরোটা তুলে নিয়ে কামড় বসাল কিশোর। তারমানে আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। কামড় দিয়েই অন্যমনস্কতা কেটে গেল তার। অবাক চোখে তাকাল রুটির টুকরোটার দিকে। আস্তে করে নামিয়ে রাখল প্লেটে। চাচার দিকে তাকাল। 'কেন সন্দেহ করলাম? ক্যারিনা হুপারকে ভুল বুঝিয়েছেন তিনি। বলেছেন, ছবিটার কোন দাম নেই। ক্যারিনা চলে যাবার পর ছবিটা হাতে নিয়ে দেখতে লাগলেন। আমি নিজের চোখে দেখেছি। আর মুসা দেখেছে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করতে। ব্যাপারটা কি দাঁড়াল?'

'তারমানে তুই বলতে চাস,' রাশেদ পাশা বললেন, 'ছবিটা দেখেই বুঝে ফেলেছিলেন তিনি ওটা দামী জিনিস। নিজেই কিনতে চেয়েছিলেন। ক্যারিনা হুপারের আগ্রহ দেখে তাঁকে ঠেকানোর জন্যে মিথ্যে কথা বলেছেন। এই তো? তাঁর মত একজন লোককে সন্দেহ করাটা কি ঠিক হচ্ছে?'

'ঠিকবেঠিক জানি না। পুরো ঘটনাটা নিজের চোখে দেখলে তুমিও সন্দেহ

করতে। মিস হুপারকে বলেছেন ওটা সাধারণ ছবি। অন্য আরেকজন মহিলাকে বলেছেন আবার অন্য কথা। তখন বলছিলেন, এ ধরনের গ্যারেজ সেলে মাঝে মাঝে অনেক দামী জিনিসও বেরিয়ে যায়। এমন একটা ছবির কথা বলেছেন তিনি, যেটা বিশ ডলার দিয়ে কেনা হয়েছিল গ্যারেজ সেল থেকে। পরে নিলামে বিক্রি হয়েছিল দশ লক্ষ ডলারে।'

দম নেওয়ার জন্য থামল কিশোর।

অপেক্ষা করছেন রাশেদ পাশা।

'এমনও তো হতে পারে,' আবার বলল কিশোর, 'ছবিটা দেখেই বুঝে গিয়েছিলেন তিনি, এটা দামী। সে-কারণে অতি আগ্রহী ক্রেতা মিস ক্যারিনা হুপারকে ছবিটা সম্পর্কে ভুল ধারণা দিয়ে ভাগিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর নিজে কিনতে গেলে যদি দেখে ফেলেন মিস হুপার, প্রশ্ন তোলেন, সেজন্যে কেনার ধার দিয়ে আর যাননি মিস্টার কারনারসন। স্রেফ চুরি করে নিয়ে গেছেন। কিন্তু চোর হতে বাধছিল তাঁর। সেজন্যে রশিদ না নিয়ে মিসেস রোজানের অলক্ষে দশটা ডলার ঢুকিয়ে রেখে গেছেন তাঁর ক্যাশ বাক্সে। ছবিটার গায়ে দশ ডলার দামের স্টিকারই লাগানো ছিল। রশিদ কাটেননি বলে দশ ডলারের হিসেব মেলাতে পারছিলেন না মিসেস রোজান। রশিদের হিসেব অনুযায়ী দশ ডলার বেশি হয়ে গিয়েছিল তাঁর বাক্সে।'

'হ্যাঁ, যুক্তি আছে তোর কথায়,' মাথা ঝাঁকালেন চাচা। 'কারনারসন ছাড়া আর কাকে সন্দেহ করিস? এইমাত্র বললি, মিস হুপারও ছবিটার ব্যাপারে প্রচুর আগ্রহ দেখিয়েছেন। তিনি চুরি করেননি তো?'

'করতেও পারেন,' কিশোর বলল। 'তবে তাঁর বেলায় যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না। টাকা দিয়েই তো কিনে নিতে পারতেন তিনি। চুরি যদি করেই থাকেন, একমাত্র প্রতিযোগিতার ভয়ে করেছেন। তাঁর আগেই অন্য কেউ কিনে ফেলার ভয়ে ঝুঁকিতে না গিয়ে মেলায় বিক্রি শুরু হওয়ার আগেই গাপ করে দিয়েছেন। যাই হোক, সন্দেহের তালিকায় তাঁকেও রেখেছি। বাদ দিইনি।'

মেরিচাচীর খাওয়া শেষ। উঠে দাঁড়িয়ে টেবিল পরিষ্কার করতে লাগলেন। কিশোরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ফ্রিজে স্ট্রবেরি পাই আছে। কাল বানিয়েছিলাম। খাবি নাকি?'

'খাব।'

স্বামীর দিকে তাকালেন। 'তুমি খাবে? নাকি দই খেয়েই পেট ভরে গেছে?'

'ভরুক। তোমার বানানো স্ট্রবেরি পাই, শুধু পেট কেন, গলা পর্যন্ত ভরা থাকলেও খাব।' ভাতিজার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলেন 'কী বলিস, কিশোর?'

'ঠিক।'

নয়

খাওয়ার টেবিল থেকে উঠে সোজা নিজের ঘরে চলে এল কিশোর। দাঁত ব্রাশ করল। মুখ-হাত ধুলো। তারপর এসে বসল পড়ার টেবিলে। লাল নোটবুকটা টেনে নিল। ভাবনাগুলো অনেক সময় সে লিখে লিখে ভাবে। জটিল সমস্যার জট ছাড়াতে সুবিধে হয় তাতে।

নোটবুক খুলে একটা সাদা পাতা বের করল সে। তাতে গোটা গোটা করে লিখল: হারানো ছবির রহস্য।

তার নিচে লিখল: সন্দেহভাজনরা।

এবং তার নিচে:

১। নিনা হাওয়ার্ড: ব্যালেরিনা-ছবিটার ব্যাপারে আগ্রহী। ঘরের দেয়ালে সাজিয়ে রাখতে চায়। কালো ব্যাগে ভরে একটা ছবির মত জিনিস নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল রোজানদের বাড়ি থেকে।

২। ডেভিড কারনারসন: মুসা তাঁকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে ছবি পরীক্ষা করতে দেখেছে। নিশ্চয় ছবিটা তাঁর কাছে দামী মনে হয়েছে।

৩। ক্যারিনা হুপার ছবিটা তিনিও কিনতে চেয়েছিলেন। কেটে কেটে কোলাজ বানানোর জন্যে।

এ পর্যন্ত এসে লেখা বন্ধ করল কিশোর। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে লেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর মুখ তুলে ঘরের চারপাশে চোখ বোলাতে শুরু করল। মুসার কথা ভাবল। নিনার কথা ভাবল। দু'জনেই ব্যালেরিনা-ছবিটা দিয়ে নিজেদের বেডরুম সাজাতে আগ্রহী। টিনা ড্রাউসনের কথা মনে পড়ল। সে বলেছে, তার বেডরুমটা নতুন করে সাজিয়ে দিতে রাজি করিয়েছে বাবা-মাকে। ষাটের দশকের 'থিম' দিয়ে, অর্থাৎ ষাটের দশকে যে ভাবে ঘর সাজাত লোকে, সে-রকম করে।

নিজের ঘরের আসবাবপত্রগুলোর ওপর চোখ বোলাল কিশোর। সমস্ত জিনিস দেখল। নিজেকে প্রশ্ন করল: সে কি কোন জিনিস বদলাতে চায়? জবাব: না, চায় না। যা আছে, খুব ভাল আছে। কোন জিনিস বদলাতেও চায় না, নতুন করে কিছু ঢোকাতেও চায় না। ঘর নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথা নেই তার। অত খুঁতখুঁতিও নেই।

নিজেকে প্রশ্ন করল আবার, যদি কখনও বদলাতে ইচ্ছে করে? কোন থিমটা তার বেশি পছন্দ হবে? কম্পিউটার খুললেই নানা রকম থিম পাওয়া যায়।

সেগুলো থেকে যে কোনটা বেছে নিতে পারে। নিজেকে বলল, আমি নিলে 'রহস্যময়' আবহটাই বেছে নেব। তবে আপাতত আমি যা আছে তা নিয়েই মহাখুশি। বদলাতে গেলেই সমস্যা। এটা পছন্দ হলে ওটা হবে না, ওটা হলে সেটা হবে না, অকারণ একটা যন্ত্রণার মধ্যে ফেলে দেয়া হবে মগজটাকে।

আবার নোটবুকে নজর ফেরাল সে। 'হারানো ছবির রহস্য'-র নীচে লেখা কথাগুলো বার বার করে পড়ল। পড়তে পড়তে তার মনে হলো, মূল্যবান কোন একটা সূত্র ধরতে পারছে না। সেটা পাওয়া গেলেই হয়তো রহস্যটার সমাধান হয়ে যেত। বহু ভেবেও সূত্রটা মাথায় আনতে পারল না সে।

চোখের পাতা ভরী হয়ে আসছে। সারাদিনের কঠোর পরিশ্রম। এতক্ষণ যে জেগে থাকতে পেরেছে, এটাই' বেশি। রহস্য নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে বলেই পারছে। আর রাত করা উচিত হবে না। আগামী দিন সকালে উঠেই আবার যেতে হবে রোজানদের বাড়ির গ্যারেজ সেলে।

'দেখি, কাল সকালে ও বাড়িতে গিয়ে হয়তো সূত্রটা পেয়ে যাব,' হাই তুলতে তুলতে নিজেকে বোঝাল সে।

নোটবুক বন্ধ করে আগের জায়গায় রেখে দিয়ে উঠে এল চেয়ার থেকে।

বিছানায় শুয়ে নিভিয়ে দিল পাশের নাইটস্ট্যান্ডের আলোটা।

দশ

'বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে,' আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল রবিন।

রোববারের সকাল। রোজানদের বাড়িতে যাচ্ছে তিন গোয়েন্দা। আগের দিনটা কী সুন্দর রোদ ঝলমলে ছিল। গতকালকের বিকেলটা দেখে কল্পনাই করতে পারেনি আজ এ রকম আবহাওয়া হয়ে যাবে। কালচে ধূসর হয়ে আছে আকাশের রঙ। ভারী মেঘে ঢাকা। ভেজা বাতাস। নিরানন্দ পরিবেশে।

'আমার আগামী সপ্তার অ্যালাউন্স থেকে পাঁচ ডলার অ্যাডভান্স দিতে রাজি করিয়ে ফেলেছি রাতে মাকে,' মুসা জানাল। 'আমার কাছে আছে দুই। পাঁচে আর দুইয়ে সাত। মাত্র আর তিন ডলার জোগাড় করতে পারলেই ছবিটা আমি কিনে ফেলতে পারি। কিন্তু সমস্যাটা হলো গিয়ে...'

'ছবিটাই নেই,' মুসার কথাটা শেষ করে দিল কিশোর। জিনসের প্যান্টের দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে হাঁটছে সে। 'ভাবছি, সন্দেহভাজনদের সঙ্গে কথা বললে কেমন হয়? মিস্টার কারনারসন, মিস ক্যারিনা হুপার, নিনা হাওয়ার্ড। বিশেষ করে নিনা।'

'ওর বাড়ি চলে গেলেই পারি,' রবিন বলল। 'কাল ছিল না, আজ নিশ্চয় আছে। সকাল সকাল তো। তা ছাড়া মেঘলা দিন। কোথাও না বেরোনোরই কথা।'

'ভাল কথা মনে করেছ,' কিশোর বলল। 'চলো।'

পথের বাঁক ঘুরে এসে রাস্তা পেরোল তিনজনে। নিনাদের বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। সেদিকে এগোল।

আগের দিনের মতই বাড়ির সামনের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। বেল বাজানোর জন্য হাত বাড়াতে গিয়েও থেমে গেল কিশোর।

'কী হলো?' রবিনের প্রশ্ন।

'ওই দেখো!' হাত তুলল কিশোর।

মুসা আর রবিনও দেখতে পেল নিনাকে। বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আঙিনা পার হয়ে তাড়াহুড়ো করে চলে যাচ্ছে। হাতে সেই কালো ব্যাগ। তার ভিতরে চ্যাপ্টা ছবির মত জিনিসটা আছে। আগের দিন যেটা নিনাকে নিয়ে যেতে দেখেছিল কিশোর।

এগারো

'নিনা! এই নিনা!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। দৌড় দিল ওকে ধরবার জন্য। পেছনে ছুটল রবিন ও মুসা।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল নিনা। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল তিন গোয়েন্দার দিকে। চোখে সন্দেহ। 'কী হয়েছে তোমাদের?'

'তোমার ওই প্যাকেটের মধ্যে কী আছে?' সরাসরি জিজ্ঞেস করল রবিন।

হাতের প্যাকেটটা ঘাসের উপর নামিয়ে রেখে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল নিনা। 'আমার ব্যাগে কি আছে না আছে, সেটা তোমাদের জানার দরকারটা কী?'

'এটার মধ্যে সেই ব্যালেরিনা-ছবিটা আছে, তাই না?' মুসা বলল। 'রোজানদের গ্যারেজ সেল থেকে চুরি করেছ যেটা!'

'কী বললে?' মুসার কথা বিশ্বাস করতে পারছে না যেন নিনা। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। তারপর হাসল। 'আমার সঙ্গে মস্করা করছ, তাই না?'

পরস্পরের দিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা। তারপর মুসা বলল, 'মজা করতে যাব কেন? কাল তোমাকে ওই ব্যাগটা নিয়েই রোজানদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছে কিশোর।'

'তোমাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে!' আবার রেগে গেল নিনা 'এই ব্যাগে ব্যালেরিনা-পেইন্টিংটা নেই!'

'কী আছে তা হলে?' রবিনের প্রশ্ন।

দ্বিধা করতে লাগল নিনা।

'জবাব দিচ্ছ না কেন?' আবার বলল রবিন।

'দিতে আমি বাধ্য নই,' ঝাঁঝাল কণ্ঠে নিনা বলল। 'তারপরেও বলি। যেহেতু আমাকে সন্দেহ করছ। এর মধ্যে একটা ছবির ফ্রেম আছে। অ্যান্টিক। আমাদের পাশের বা গতে যে ভদ্রমহিলা থাকেন, মিসেস ওয়াগনার, এ জিনিসটা তাঁর। রোজানদের গাড়ির গ্যারেজ সেল থেকেই কিনেছেন। বুড়ো মানুষ। বাড়ি নিয়ে যেতে কষ্ট হ চ্ছিল। আমি বললাম, 'ঠিক আছে, আমাকে দিন, আমিই দিয়ে আসছি।'

'তাহলে গতকালই দিয়ে এলে না কেন?' কিশোর জিজ্ঞেস করল। 'এখনও তোমার কাছে কেন?'

'আর বোলো না!' তিক্তকণ্ঠে জবাব দিল নিনা। 'এ জন্যেই যেচে পড়ে মানুষের উপকার করতে নেই। মিসেস ওয়াগনারের কোন দোষ নেই অবশ্য, আমিই ঝামেলাটা পাকিয়েছি। সাহায্য করতে গিয়ে ভেজালে পড়লাম।'

'ভেজালটা কিসের? তোমাকে যে চোর ভাবছি সেটা?' রবিনের প্রশ্ন।

'সেটা তো আছেই,' তিক্তকণ্ঠে নিনা বলল। 'ফ্রেমটা কাল নিয়ে আসার সময় আমার হাত থেকে ফুটপাতের ওপর পড়ে এক জায়গায় চলটা উঠে গিয়েছিল। কী আর করব। বাড়ি নিয়ে এসে মাকে দেখালাম। রাতে অনেক কষ্ট করে সুপার-গ্লু দিয়ে চলটাটা লাগিয়েছি মা আর আমি মিলে। তারপরেও আগের মত কি আর হয়। এটা দেখে এখন কী বলেন মিসেস ওয়াগনার, সেই ভয়েতেই আছি!' চোখমুখ কুঁচকে তিন গোয়েন্দার দিকে তাকাল নিনা। 'তোমাদের সন্দেহ দূর হয়েছে? নাকি খুলে না দেখে ছাড়বে না?'

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। 'না, আর দেখে কি করব।' কিশোরের দিকে তাকাল সে। 'তারমানে ছবিটা এখনও নিখোঁজই রয়ে গেল!'

'পুরানো একটা সাধারণ ছবি নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন তোমরা?' নিনা জিজ্ঞেস করল।

'সাধারণ!' ভুরু কুঁচকে গেল মুসার। 'তাহলে তুমি ওটা কেনার জন্যে অস্থির হয়ে গিয়েছিলে কেন কাল?'

'কাল হয়েছিলাম। আজ আর দিলেও কিনব না। অত সাংঘাতিক কিছু না ওটা।' ঝাঁকি দিয়ে মুখের সামনে এসে পড়া চুলগুলো পেছনে সরাল নিনা। 'ওটা নিয়ে কেন যে এত মাতামাতি করছ তোমরা, খোদাই জানে!'

বারো

'বৃষ্টির ফোঁটা পড়ল নাকি?' আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকালেন মিসেস রোজান।

ন'টা বাজে। গ্যারেজ সেল শুরুর সময় হয়েছে। কিন্তু বাড়ির আঙিনায় আজ মাত্র দু'জন কাস্টোমার। এই আবহাওয়ায় ঘর থেকে বেরোবে না লোকে। কালো মেঘ ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত আকাশ জুড়ে বৃষ্টিও শুরু হয়ে গেছে। কিশোরের ধারণা, আজ আর জমবে না গ্যারেজ সেল।

প্রচুর জিনিস রয়ে গেছে এখনও। আগের দিন বিক্রি হয়নি। সেগুলো বাক্স থেকে বের করে টেবিলে সাজানো সবে শেষ করেছে তিন গোয়েন্দা, অনি ও মিসেস রোজান, এ সময় বৃষ্টির প্রথম ফোঁটাটা পড়ল।

টেবিলে সাজানো জিনিসগুলোর উপর চোখ বোলাল কিশোর। রবিনের খেলনা গাড়ি, মুসার সিডি আর ক্রিকেট ব্যাট, অনির পুরানো হ্যালোউইনের পোশাক, এগুলো রয়ে গেছে এখনও। বিক্রি হয়নি। ওর নিজের পারকা আর দস্তানাজোড়াও বিক্রি হয়নি।

কিশোর যে কলমটা কিনতে চেয়েছিল, সেটাও আছে। রবিনের পছন্দের কমিকের বইগুলো আর ভিডিও গেমগুলোও আছে। আছে অনির পছন্দ করা পুঁতির মালাটাও।

হতাশ চোখে টেবিলগুলোর দিকে তাকালেন মিসেস রোজান। 'ভিজে যাবে। ঢেকে দেয়া দরকার। গ্যারেজে প্লাস্টিকের চাদর আছে। জলদি চলো!'

দ্রুতপায়ে গ্যারেজের দিকে রওনা হলেন তিনি। পেছনে চলল রবিন, মুসা ও অনি। কিশোরও রওনা হতে যাবে, এই সময় হাত পড়ল তার কাঁধে।

চমকে ফিরে তাকাল সে।

মিস ক্যারিনা হুপারকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেল। আজ আর সেই বড় বড় রঙিন ফুলের ছাপ মারা গাউনটা পরেননি। তার বদলে সাদা টি-শার্ট ও জিনসের প্যান্ট, যাতে বৃষ্টিতে হাঁটাচলা করতে অসুবিধে না হয়। কাজ করতে করতেই কোন কারণে তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে চলে এসেছেন বোধহয়। শার্ট আর প্যান্টে রঙ লেগে আছে।

'হ্যাল্লো! আবার দেখা হয়ে গেল,' হেসে বললেন তিনি। 'ছবিটা পাওয়া গেছে?

'না, পাওয়া যায়নি,' জবাব দিল কিশোর। 'খুঁজে বেড়াচ্ছি এখনও। বের না করে ছাড়ব না।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগলেন মিসেস হুপার 'ওটার জন্যেই এসেছিলাম। নইলে এই বৃষ্টির মধ্যে কে বেরোয়। ছবিটা খুব দরকার ছিল আমার। যতই ভাবছি ততই মনে হচ্ছে আমার নতুন কোলাজটাতে দারুণ মানাত। কয়েক দিন পরেই আমি একটা শো করতে যাচ্ছি। খুব ব্যস্ত আছি সেজন্যে। ও, হ্যাঁ, ভাল কথা...'

পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা পোস্টকার্ড সাইজের লাল কার্ড বের করলেন তিনি। 'নাও, তোমাদের জন্যে। তুমি আর তোমার বন্ধুদের দাওয়াত করেছি আমার শো'তে। এসো কিন্তু। এলে খুশি হব। তোমাদের বাবা-মায়েরা যদি আসতে চান, তাঁদেরকেও নিয়ে এসো। আমার স্টুডিওতেই শো-এর ব্যবস্থা করব। এই তো কাছেই। এখান থেকে মাত্র দুই ব্লক দূরে।'

'যাব। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে,' কার্ডটা নিতে নিতে বলল কিশোর। হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখল। ইংরেজিতে লেখা কথাগুলোর বাংলা করলে দাঁড়ায়: ক্যারিনা হুপারের ইদানীংকার সৃষ্টিগুলো দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল। শো'র সময়: ২২ এপ্রিল, বিকেল ২.০০-৪.০০। ১৭/এ শোর রোড, রকি বীচ। সবাইকে স্বাগতম।

বেশি বৃষ্টি নামবার আগেই তাড়াহুড়া করে চলে গেলেন মিস হুপার।

টেবিলে সাজানো জিনিসগুলো প্লাস্টিকের চাদর দিয়ে ঢাকতে মিসেস রোজান ও অনিকে সাহায্য করল তিন গোয়েন্দা। কাজ করতে করতে গেটের দিকে চোখ পড়ল কিশোরের। লম্বা এক ভদ্রলোককে ঢুকতে দেখে হাত থেমে গেল তার। দ্রুত হেঁটে আসছেন ভদ্রলোক। মিস্টার ডেভিড কারনারসন!

কাছে এসে কিশোরের দিকে তাকিয়ে কিছুটা রুক্ষ স্বরেই জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার? বিক্রি বন্ধ করে দিচ্ছ নাকি?'

'বন্ধ না,' জবাব দিল কিশোর, 'ঢেকে দিচ্ছি। বৃষ্টি এলে ভিজে যাবে তো।' কারনারসনের আগমন অবাক করেছে তাকে। ফিরে এলেন কেন তিনি?

যেন তার মনের কথা বুঝতে পেরেই মিস্টার কারনারসন বললেন, 'কাল একটা রূপার ঘড়ি দেখে গিয়েছিলাম। তখন কিনিনি। কিন্তু পরে যতবারই ভেবেছি, ততবারই মনে হয়েছে কিনে ফেলা উচিত ছিল। আছে নাকি এখনও? না বিক্রি হয়ে গেছে?'

'নেই,' ঠোঁট কামড়ে ধরে মাথা নেড়ে জবাব দিল কিশোর। 'বিক্রি হয়ে গেছে।'

হতাশ হলেন মিস্টার কারনারসন। 'জানতাম, থাকবে না। কাল না কিনে ভুলই করেছি। যাকগে, কী আর করা!' বিড়বিড় করে নিজেকে দোষারোপ করতে লাগলেন তিনি। যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ালেন।

'এক মিনিট, মিস্টার কারনারসন,' বিনীত ভঙ্গিতে ডাক দিল কিশোর।

'ব্যালেরিনা-পেইন্টিংটার কথা মনে আছে আপনার?'

ঘুরে দাঁড়ালেন মিস্টার কারনারসন। এক ভুরু উঁচু করলেন। 'কোন পেইন্টিং?...অ, সেই পচা ছবিটা। অর্থহীন। কোন মূল্য নেই। কেন?'

'অর্থহীন বলছেন, মূল্যহীন বলছেন। কালও এ-সব কথাই বলেছেন মিসেস ক্যারিনা হুপারকে। তাহলে পরে আবার এত মনোযোগ দিয়ে দেখছিলেন কেন?'

'দেখছিলাম, ওটাতে কারও সই আছে কিনা,' জবাব দিলেন কারনারসন। 'নাম দেখলে বুঝতে পারতাম ছবিটা যে এঁকেছে সে এখানকার স্থানীয়, না অন্য কোন শহরের। ওটা নিয়ে একটা প্রতিবেদন লেখার চিন্তা-ভাবনা করছি, যাতে আজেবাজে জিনিস কিনে মানুষকে ঠকতে না হয়।' ভুরু কুঁচকে তাকালেন কিশোরের দিকে। 'কেন, মনোযোগ দিয়ে ছবি দেখা কি বারণ? বেআইনী কিছু করেছি?'

'না না, তা না,' কিশোর বলল। 'ছবিটা চুরি হয়ে গেছে। ওটা খুঁজে বেড়াচ্ছি আমরা। সেজন্যে যাকেই কাল ছবিটার ব্যাপারে আগ্রহী দেখেছি, তাকেই জিজ্ঞেস করছি।'

'চুরি হয়ে গেছে? ও রকম একটা ফালতু ছবি চুরি করার সাধ হলো আবার কার?' কিশোরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চাহনি বদলে গেল মিস্টার কারনারসনের। 'আমাকে সন্দেহ করছ না তো?'

'সত্যি কথা বলব?' আমতা আমতা করতে লাগল কিশোর। 'কিন্তু এখন...'

'এখন কি?'

'এখন যখন জানলাম, ছবিটাতে সই খুঁজছিলেন আপনি...'

'দেখো, ইয়াং ম্যান!' চোখের পাতা সরু হয়ে এল মিস্টার কারনারসনের। 'প্রমাণ ছাড়া কাউকে সন্দেহ করার আগে হাজারবার চিন্তা করা উচিত। বিশেষ করে আমার পর্যায়ের একজন মানুষকে।'

আচমকা ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। জুতোর গট গট শব্দ তুলে রাগত ভঙ্গিতে হেঁটে চলে গেলেন।

তেরো

'খুব রেগে গিয়েছিলেন মিস্টার কারনারসন,' পরে বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলবার সময় বলল কিশোর। 'অবশ্য রাগারই কথা।'

দশটা বাজে। গ্যারেজ সেলের বারোটা বাজিয়েছে আবহাওয়া। বসে না থেকে বরং ক্যারিনা হুপারের স্টুডিওর কাছ থেকে ঘুরে আসবার চিন্তা-ভাবনা

করছে কিশোর। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে আসতে চায়, ক্যারিনা হুপারের স্টুডিওর ভিতরটা। বলা যায় না, হয়তো দেয়ালে ঝোলানো দেখতে পাবে ব্যালেরিনা-পেইন্টিংটা। কাল চুরি করে নিয়ে গিয়ে আজ কেনার ছুতো করে জানতে এসেছিল, তাঁকে কেউ সন্দেহ করছে কিনা।

সন্দেহের কথাটা জানাতেই কিশোরের সঙ্গে যেতে রাজি হয়ে গেল তার দুই সহকারী ও অনি।

দেরি করল না ওরা। রওনা হয়ে গেল তখুনি। রোজানদের বাড়িতে ছাতা পাওয়া গেছে মাত্র দুটো। তাতেই কোনোমতে কাজ চালানোর ব্যবস্থা করেছে। একটা ছাতা ভাগাভাগি করে মাথায় দিয়েছে কিশোর ও মুসা। আরেকটা অনি ও রবিন।

'মিস্টার কারনারসন তো শুনেই রেগে গেলেন,' হাঁটতে হাঁটতে মুসা বলল। 'কিন্তু আসলে ঘটনাটা কী? ছবিটা কি সত্যিই নেননি তিনি?'

'কি জানি! তবে একটা কথা তিনি ঠিকই বলে গেছেন: কাউকে সন্দেহ করার আগে ভালমত চিন্তা করা উচিত। প্রমাণ দরকার।'

পকেট থেকে মিসেস হুপারের দেওয়া কার্ডটা বের করে ঠিকানা দেখল কিশোর। বাড়িটা খুঁজে বের করল। লাল রঙ করা দেয়াল। সবুজ জানালা। মূল বাড়ির পেছনের আঙিনায় একটা গোলাঘর আছে। ওটার রঙও লাল। বড় বড় জানালা। স্কাইলাইট আছে।

'ওটাই মিস হুপারের স্টুডিও,' কিশোর বলল, 'আমি শিওর।'

'কী করে বুঝলে?' মুসার প্রশ্ন।

'দেখছ না, নতুন রঙ করা। শো করবেন তো। তাই সাফ-সুতরা করে ফেলেছেন।'

'ইস্, আমার যদি ও রকম একটা স্টুডিও থাকত!' অনি বলল। 'আমার নাটকের সমস্ত পোশাক ওখানে রেখে দিতে পারতাম। রিহার্সাল দিতে পারতাম। এমনকি একটা নাটক শো করার ব্যবস্থাও করতে পারতাম। আমি হতাম ওটার নায়িকা। নাটকটার নাম কী দিলে ভাল হয়, বলো তো? হারানো ছবির রহস্য? নাকি গ্যারেজ সেল রহস্য?'

হাসল কিশোর। 'স্টুডিওই যখন নেই, নাম নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে লাভ কী? চলো, যে কাজ করতে এসেছি, সেটাই করি।'

আঙিনা পার হয়ে স্টুডিওর দিকে এগোল সে আর মুসা। পেছনে রবিন ও অনি।

গোলাবাড়িটার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল মুসা। ফিসফিস করে বলল, 'শুনছ!'

হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত হয়ে গেল কিশোরের। শুনেছে। স্টুডিওর ভিতর থেকে

ভেসে আসছে একটা ভয়ঙ্কর অমানবিক শব্দ। তীক্ষ্নস্বরে চিৎকার করছে কে যেন!

চোদ্দ

থেমে গেল চিৎকারটা। কান পেতে আছে কিশোর। আবার শোনা গেল। সত্যি অদ্ভুত! অনেকটা মানুষের চিৎকারের মতই। কিন্তু অন্য রকম। কিঁচকিঁচে। আর ভীষণ তীক্ষ্ন।

কোন জন্তুর চিৎকার?

এত জোরে লাফাচ্ছে কিশোরের হৃৎপিণ্ড, মনে হচ্ছে খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে যাবে। কমানোর চেষ্টা করেও পারছে না। ভূত মনে করে দৌড় দেবার কথা ভাবছে মুসা। সেটা বুঝতে পেরে তার হাত চেপে ধরে রেখেছে কিশোর।

তবে ভয় কেউই কম পাচ্ছে না। মুসা, কিশোর, রবিন, অনি, কেউ বুঝতে পারছে না শব্দটা আসলে কিসের।

সামনেই একটা বড় জানালা। দৃশ্য যত ভয়ঙ্করই হোক, না দেখে যাবে না কিশোর। পা টিপে টিপে জানালাটার দিকে এগোল। আস্তে করে মাথা উঁচু করে উঁকি দিল ভিতরে। জানালার কাঁচে ধুলোবালি জমে, রঙ লেগে ময়লা হয়ে আছে। তার ভিতর দিয়ে তাকাল সে।

মস্ত বড় একটা ঘর। অনেক উপরে ছাত। দেয়াল ঘেঁষে রাখা উঁচু উঁচু তাক। নানা রকমের ফুলদানি, সাগর থেকে আনা ঝিনুকের খোসা, টবে লাগানো গাছ আর অ্যানটিক পুতুলে বোঝাই। ফুলদানিগুলোতে ফুল আছে, শুকনো। নতুন করে আর বদলানো হয়নি। মেঝেতে কার্পেট নেই, ম্যাটও নেই। প্লাস্টিকের চাদর পাতা। তার ওপরে রঙ লেগে থাকা নেকড়া, ছোট বড় বালতি আর নানা সাইজের ব্রাশের ছড়াছড়ি। রঙের টিন আর কৌটা যে কত আছে, তার কোন সীমা-সংখ্যা নেই। যত রকমের রঙ পাওয়া যায়: লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, কালো, সাদা, বেগুনি, রূপালি, সোনালি, সব আছে।

ঘরের অন্য প্রান্তে এক কোণে দাঁড়িয়ে কাজ করছেন ক্যারিনা হুপার । লম্বা সাদা অ্যাপ্রনের মত পোশাকে গা ঢাকা। চোখে একটা বড় কালো চশমা। চশমাটা এত বড়, অদ্ভুত লাগছে তাঁর মুখটা।

'শব্দটা কিসের?' কানের কাছে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'ভূতের, আবার কিসের!' জানালা দিয়ে উঁকি দিতেও ভয় পাচ্ছে মুসা। 'চলো, পালাই! সময় থাকতে থাকতে!'

'আরে দাঁড়াও, দেখি,' কিশোর বলল। ঘরের ভিতরটা আরও ভালমত

দেখবার জন্যে জানালার কাচে নাক চেপে ধরল সে। 'হায়রে, কী কাণ্ড! কী যেন কাটছেন মিস হুপার । ইলেকট্রিক করাতের দাঁতে লেগে ও রকম শব্দ করছে আর আমরা কত কিছু ভেবে মরছি।'

মুহূর্তে ভয় চলে গেল সবার। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এল চারজনে। কিশোরের মত করে জানালার কাঁচে নাক ঠেকিয়ে ভিতরে উঁকি দিল। ধাতব ফ্রেমওয়ালা মোটা একটা ক্যানভাসে করাত চালাচ্ছেন মিস হুপার । শুধু ক্যানভাসে যখন লাগছে তখন খ্যাড়খ্যাড় করছে, কিন্তু ধাতব ফ্রেমে করাতের দাঁত লাগবার সঙ্গে সঙ্গে কিঁচকিঁচ করে তীক্ষ্ণ চিৎকারের মত শব্দ বেরোচ্ছে।

'খাইছে!' চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও কণ্ঠস্বর নামিয়ে ফেলল মুসা। 'আমার ব্যালেরিনা-ছবিটা কেটে ফেলছেন!'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'না, ব্যালেরিনাটা না।'

'কী করে বুঝলে?'

'রঙ দেখে। ওটাতে শুধু সাদা, বেগুনি আর লাল রঙ ছিল।'

'আর এটাতে?'

'কেন, দেখতে পাচ্ছ না? এটার বেশির ভাগটাই হলুদ। বাকিটা লাল।'

এতক্ষণে খেয়াল করল মুসা। 'হ্যাঁ। তাই তো! আমি একটা গাধা!'

'দেয়ালের কোথাও কিন্তু ব্যালেরিনাটা নেই,' রবিন বলল। 'ওই যে, বাঁ কোণের কাছে সেই ছবিটা। কাল যেটা গ্যারেজ সেল থেকে কিনেছেন। অ্যাথেনা দেবী। ওটার পাশের ছবিটা তো শুধু কতগুলো মাছের। নাহ্, ব্যালেরিনা-পেইন্টিংটা নেই এখানে।'

'সন্দেহের তালিকা থেকে এখন বাদ দেয়া যায় মিস হুপারকে,' কিশোর বলল।

'অন্য কোনোখানে লুকিয়ে রাখেননি তো?'

'আমার মনে হয় না।'

'তো?' ভুরু কুঁচকে বলল অনি। 'ঘটনাটা কি দাঁড়াল? নিনা বাদ। কারণ ওর হাতে অন্য ছবির ফ্রেম ছিল। মিস হুপারও বাদ। তিনি ছবিটা আবার কিনতে এসেছিলেন। তাঁর স্টুডিওতেও দেখা যাচ্ছে না। সন্দেহ করা হচ্ছে শুনেই রেগে উঠেছেন মিস্টার কারনারসন। তা ছাড়া ছবিটাকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করার কারণও জানিয়েছেন। তারমানে তিনিও বাদ। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে তিনজনকে সন্দেহ করা হয়েছিল, তাদের কেউই ছবিটা নেয়নি। কে নিল তাহলে?'

'সেটা আর কোনোদিনও জানতে পারব না আমরা!' ককিয়ে উঠল মুসা 'ছবিটাও আর পাব না আমি!'

'চলো, আমি তোমাদের সবাইকে আইসক্রীম খাওয়াব,' অনি বলল। 'মা

পয়সা দিয়ে দিয়েছে।' মুসার দিকে তাকাল। 'আইসক্রীম পেলে ছবির দুঃখ কমবে তো?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'কমবে। তবে সবটা না।'

পনেরো

'হুঁ, সুপার-ডুপার-গ্রুপার-গোল্ডেন-অ্যামিউজমেন্ট!' বলে আয়েশ করে কোণ-আইসক্রীমে কামড় বসাল অনি। 'দারুণ টেস্ট। এক কামড়েই বুঝে গেছি এটা আমার ফেভরিট হয়ে যাবে।'

'আমার হবে না,' মুখ গোমড়া করে জবাব দিল মুসা। 'এত খটমটে নাম কে মনে রাখে। এরচেয়ে হাড়ুম-ধুড়ুম-খুড়ুম কিংবা ভাটুস-ভুটুস-ফুটুস রেখে দিলেই পারত। মনে রাখতে অন্তত সুবিধে হতো।'

তার কথা শুনে দোকানদারও হেসে অস্থির।

যাই হোক, একটা করে আইসক্রীম খেয়ে, এবং বাড়তি আরও একটা হাতে নিয়ে বেরোনোর সময় মুসার মুখ আর ততটা গোমড়া থাকল না। অনির সঙ্গে একমত হতে বাধ্য হলো সে, এই 'খটমটে' নামের আইসক্রীমটা তারও প্রিয় আইসক্রীমে পরিণত হয়েছে। দোকান থেকে বেরিয়ে আরও একটা জিনিস ভাল লাগল ওদের, আকাশের অবস্থা দেখে।

বৃষ্টি থেমেছে। ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে সূর্য উঁকি দিচ্ছে।

তবে কিশোর ভীষণ চিন্তিত। রহস্যটার সমাধান করতে পারেনি এখনও। ছবিটা কে চুরি করেছে, জানা যায়নি।

বৃষ্টি শেষ। গায়ের জিন্সের জ্যাকেটটা আর গায়ে রাখতে পারছে না সে। গরম লাগছে। ওর হাতের আইসক্রীমটা রবিনের হাতে রাখতে দিল। জ্যাকেটটা খুলে নিয়ে কোমরে পেঁচাল। তারপর আইসক্রীমটা ফেরত নিয়ে কামড় বসাল তাতে। স্বাদটা সত্যিই ভাল। এ শহরে নতুন এসেছে এই আইসক্রীম। খুব শীঘ্রি যে এখানকার ছেলেমেয়েদের প্রিয় হয়ে যাবে, তাতে তারও কোন সন্দেহ নেই।

আইসক্রীম খেতে খেতে ভাবছে কিশোর। সন্দেহের তালিকায় যে তিনজন ছিল, আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে তাদের কেউই ছবিটা চুরি করেনি। তবে ছবিটা ফেরত না পাওয়া পর্যন্ত কারোর ওপর থেকেই সন্দেহ যাবে না ওর। ওর দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরানোর জন্যে নানা ভাবে ওকে ফাঁকি দিয়ে থাকতে পারে সন্দেহভাজনরা।

সমাধান করতে না পারবার দুঃখেই যেন গায়ের ঝাল মেটানোর জন্যে

কামড়ে কেটে নিল আইসক্রীমের অনেকখানি। ফুটপাত ধরে চিন্তিত ভঙ্গিতে হেঁটে চলল বাকি তিনজনের সঙ্গে।

হঠাৎ যেন হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল সে।

ঠিক পেছনেই ছিল রবিন। কিশোরের গায়ের উপর এসে পড়ল।

রবিনের হাতের আইসক্রীম কিশোরের শার্টের পেছনে লেগে মাখামাখি হয়ে গেছে। কেয়ারই করল না কিশোর। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'অনি! ব্যালেরিনা-পেইন্টিংটার মালিক কে?'

'যে চুরি করেছে সে,' জবাব দিল মুসা।

'আহ্, তুমি চুপ করো!' হাত নেড়ে বাতাসে থাবা মারল যেন কিশোর। 'আমি চোরের কথা বলছি না। আসল মালিকের নাম জানতে চাইছি। অনি, ছবিটা কে এনেছিল তোমাদের কাছে?'

'কে!' আইসক্রীমে কামড় বসাল অনি। 'মনে করতে পারছি না। বাড়ি চলো। মাকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে। লিস্টও দেখতে পারব।'

'ছবি কে বিক্রি করতে নিয়ে এসেছিল, সেটা জেনে কী লাভ?' বুঝতে পারছে না রবিন।

'কী লাভ জানি না,' জবাব দিল কিশোর। 'তবে আমার মনে হচ্ছে তার নাম জানাটা খুব জরুরী। মূল্যবান সূত্র রয়ে গেছে এর মধ্যেই। কাল রাত থেকেই মনে হচ্ছিল, কিছু একটা মিস করে যাচ্ছি আমরা। এখন বুঝেছি, কী মিস করছিলাম।'

পথে আর কোন কথা হলো না। কারণ সবার মনেই এখন উত্তেজনা। আইসক্রীম খাওয়ার মজা শেষ। দু'তিন কামড়ে শেষ করে ফেলে দ্রুত বাড়ির দিকে পা চালাল ওরা।

অনিদের বাড়িতে পৌঁছার আগেই ঘটে গেল নতুন ঘটনা। একেবারে ওদের সামনে পড়ে গেল টিনা ডাউসন। উল্টো দিক থেকে হেঁটে আসছে সে।

'আরে টিনা, তুমি কোত্থেকে?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'অনিদের বাড়ি থেকে।'

'আজকেও গ্যারেজ সেলে গিয়েছিলে নাকি?'

জিনসের দুই পকেটে হাত ঢোকাল টিনা। জবাব দিতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করল। 'হ্যাঁ। তোমরা কি এখন ওখানেই যাচ্ছ?'

'যাচ্ছি,' মুসা বলল। 'কালকের সেই ব্যালেরিনা-ছবিটার কথা মনে আছে তোমার, টিনা? কে জানি চুরি করে নিয়ে গেছে ওটা। কাল থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কোন খোঁজই পাচ্ছি না। যাদের যাদের সন্দেহ করেছিলাম, সবার কাছেই খোঁজা হয়ে গেছে।'

'আমাকে বলছ কেন এসব?'

'তুমিও তো ছবিটা দেখেছ কাল। বলে রাখলাম আরকি। খোঁজ পেলে

জানিয়ো।'

মাটির দিকে চোখ নামাল টিনা। ছবিটির কথা শুনে কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেছে সে। অস্বস্তি বোধ করছে। চোখ এড়াল না কিশোরের।

তারপর আরও একটা জিনিস চোখে পড়ল তার। ছোট্ট, সাদা একটা জিনিস আটকে রয়েছে টিনার জিনসের জ্যাকেটের হাতায়। একটা স্টিকার। ম্যাজিক মার্কার দিয়ে লেখা রয়েছে, নম্বর: ২৩। দাম: দশ ডলার।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে টিনার দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'ছবিটা তুমিই নিয়ে গেছ, তাই না?'

ষোলো

গাল লাল হয়ে গেল টিনার। ফিসফিস করে 'হ্যাঁ' শব্দটা এমনভাবে উচ্চারণ করল সে, কোনোমতে শোনা গেল।

হাঁ করে দীর্ঘ একটা সেকেন্ড টিনার দিকে তাকিয়ে রইল মুসা, রবিন ও অনি। তারপর কিশোরের দিকে ফিরল মুসা। 'তুমি কী করে বুঝলে?'

টিনার জ্যাকেটের হাতায় লেগে থাকা স্টিকারটা দেখাল কিশোর। 'দাম লেখা ওই ট্যাগটাই লাগানো ছিল ব্যালেরিনা-ছবিটার পেছনের ক্যানভাসে।' অনির দিকে তাকাল কিশোর। 'তোমার আম্মা যখন দাম লিখছিলেন, ওখানে দাঁড়ানো ছিলাম আমি। বিক্রেতার নম্বর ছিল তেইশ, আর নাম...'

'আমিই ওটা বিক্রি করতে নিয়ে গিয়েছিলাম,' টিনা বলল। 'ছবিটা আমারই ছিল।'

'কী!' একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল মুসা, রবিন ও অনি।

কিশোর অবাক হলো না। শান্তকণ্ঠে বলল, 'প্রথমে ভুল তিনজন লোককে সন্দেহ করেছিলাম আমি। আসল সূত্রটা ধরতে পারছিলাম না। পরে যখন পারলাম, তখন অনিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ছবিটার মালিক কে। ও নাম বলতে পারেনি। সেটা জানতেই যাচ্ছিলাম এখন মিসেস রোজানের কাছে।'

'তুমি তাহলে বুঝে ফেলেছিলে?' টিনা জিজ্ঞেস করল।

'এটুকু বুঝেছিলাম, ছবিটার মালিকই ছবিটা সরিয়েছে, নইলে কাল ওটা নিখোঁজ হওয়ার পরেও খোঁজ করতে এল না কেন কেউ, টাকা চাইতে এল না কেন।'

'কেন সরিয়েছি, সেটা কি বুঝেছ?'

'এখন আন্দাজ করতে পারছি। যেহেতু তুমি ওটার মালিক।'

দুই হাত বুকের উপর আড়াআড়ি করে রাখল টিনা। 'কি আন্দাজ করেছ?'

'তুমিই জানিয়েছ, তোমার ঘরটাকে নতুন করে সাজিয়ে দিতে রাজি করিয়েছ তোমার মা-বাবাকে। তাঁরা বললেন, নতুন করে সাজানোর আগে তোমার পুরানো জিনিসগুলো সব বিক্রি করে দিতে হবে।'

মাথা ঝাঁকাল টিনা। 'হ্যাঁ।'

'সেজন্যেই তুমি ছবিটা বেচতে এনেছিলে?' রবিনের প্রশ্ন।

'হ্যাঁ। ব্যালেরিনা-পেইন্টিং, কিছু আসবাব আর অন্যান্য টুকিটাকি জিনিস।'

হতভম্ব হয়ে আছে এখনও অনি। মাথা নেড়ে বলল, 'আমি এখনও কিছু বুঝতে পারছি না, আমার মাথায় ঢুকছে না, নিজের ছবি তুমি নিজেই বিক্রি করতে এনে আবার নিজেই চুরি করে নিয়ে গেলে কেন? এ রকম একটা অদ্ভুত কাণ্ড কেন ঘটালে তুমি?'

'আমি বলছি,' কিশোর বলল। 'ছবিটা অনেক দিন ধরে আছে টিনার ঘরে। বিক্রি করতে নিয়ে আসার আগে ও বুঝতেই পারেনি ছবিটাকে কতখানি পছন্দ করে।'

'ঠিক,' বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে কিশোরের কথা সমর্থন করল টিনা। 'বিক্রি করতে আনার সময়ও অতটা বুঝতে পারিনি। ট্যাগ লাগিয়ে টেবিলে রেখে দেয়ার পর যখন ক্রেতারা ওটার দিকে ঝুঁকতে লাগল...তখন আর আমি সহ্য করতে পারলাম না...'

অনি বলল, 'আমাদের বললেই হতো, তুমি ওটা আর বেচবে না। সরিয়ে ফেলতাম।'

'করা উচিত ছিল এই কাজটাই। কিন্তু কেমন এক ধরনের লজ্জা, এক ধরনের আড়ষ্টতা এমন করে চেপে ধরেছিল...'

'যে নিজের ছবি নিজেই চুরি করে নিয়ে গেলে,' কিশোর বলল।

মাথা ঝাঁকাল টিনা, 'হ্যাঁ।'

'হয় এ রকম।'

'তোমার অবস্থা আমি বুঝতে পারছি, টিনা,' সহানুভূতির সুরে বলল মুসা। 'আমিও কিছু জিনিস বিক্রি করতে এনেছি তো। পুরানো যে সিডিগুলো দিয়ে এতকাল গান শুনলাম, ক্রিকেট ব্যাট নিয়ে খেললাম, সেগুলো যখন বিক্রির টেবিলে দেখলাম, চিরকালের জন্যে হাতছাড়া হয়ে যাবে ভেবে আমারও মন কেমন করে উঠেছিল। আরেকটু হলেই সরিয়ে ফেলতে যাচ্ছিলাম টেবিল থেকে। তবে তোমার মত আমার আড়ষ্টতা ছিল না। বলে-কয়েই সরাতাম।'

মুসার দিকে তাকিয়ে শুকনো হাসি হাসল টিনা। জিজ্ঞেস করল, 'তা হলে সরালে না কেন?'

মুসা বলল, 'কারণ, ওগুলোর চেয়ে ছবিটা আমার বেশি পছন্দ হয়েছিল। ওটা

কেনার জন্যে টাকার দরকার আমার। পাব কোথায়? তখন নিজেকে বোঝালাম, যা করার করে ফেলেছি, টেবিল থেকে পুরানো জিনিস আর নামাব না। ওগুলো বিদেয় করে নতুনটাকেই ঘরে নিয়ে যাব।'

'তুমি আমার চোখ খুলে দিলে মুসা। আমি কল্পনাই করতে পারিনি, ছবিটা তোমার এত পছন্দ হয়ে গেছে।'

'যা হবার হয়েছে,' কিশোর বলল। 'চলো এখন, অনিদের বাড়িতে। টিনা, তুমিও চলো। অনির আম্মাকে সব বুঝিয়ে বলতে হবে। ছবিটা নিয়ে তিনি চিন্তিত আছেন।'

লজ্জিত স্বরে টিনা বলল, 'তোমাদের এতটা ঝামেলায় ফেললাম! কী লজ্জা যে লাগছে এখন আমার!'

হাসল কিশোর। 'থাক, বাদ দাও। ওসব নিয়ে ভেবে এখন আর মন খারাপ করার দরকার নেই। আমারই বরং তোমাকে একটা ধন্যবাদ দেয়া উচিত। একটা জটিল রহস্য সৃষ্টি করে আমাকে সেটা সমাধান করার আনন্দ দিয়েছ বলে।'

সতেরো

গ্যারেজ সেল সাংঘাতিক জমল সেদিন বিকেলে। সারাটা সকাল ঘরে কাটিয়ে দুপুরের পর রোদ উঠতেই যেন বাইরে বেরোনোর জন্য পাগল হয়ে উঠল লোকে। কেনাকাটা তো আছেই, ঘোরাফেরাটাও মজার। খদ্দের সামলাতে হিমশিম খেয়ে গেল তিন গোয়েন্দা, অনি ও অনির আম্মা। খুশিমনে ওদের সাহায্য করল টিনা।

এত বেশি বিক্রি হলো সেদিন, দিনের শেষে জিনিসপত্র প্রায় কিছুই অবশিষ্ট রইল না। রবিনের গাড়ি, অনির হ্যালোউইন পোশাক, মুসার ক্রিকেট ব্যাট-সিডি, সব বিক্রি হয়ে গেল। সেই টাকা দিয়ে রবিন কিনল কমিকের বইগুলো, অনি কিনল তার শখের পুঁতির মালা। পারকা আর দস্তানা বিক্রির টাকা দিয়ে কিশোর কিনল 'কে' অক্ষর খোদাই করা কলমটা।

রশিদ মেলানোয় ব্যস্ত হলেন মিসেস রোজান। কিশোর ও টিনা তাঁকে সাহায্য করল। এমন সময় সেখানে এসে হাজির হলো মুসা। এক ডলারের দশটা নোট দেখিয়ে বিষণ্ন কণ্ঠে বলল, 'টাকা পেয়ে গেছি। কিন্তু কেনার মত কোন জিনিস নেই।'

টিনার দিকে তাকালেন মিসেস রোজান।

হাসল টিনা। মুসাকে বলল, 'ব্যালেরিনা ছবিটা কিনবে না?'

'ওটা আর পাচ্ছ কোথায়!' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা।

'যদি আমি বেচে দিই?'

'বেচবে! আমি তো ভাবলাম...'

'না, মত বদলেছি আমি। আসলেই আমি আমার ঘরের চেহারা বদলে ফেলতে চাই। নতুন করে সাজাতে চাই। তখন ছবিটা ওখানে মানাবে না আর,' টিনা বলল। 'বিশ্বাস করো, তোমাকে খুশি করার জন্যে বিক্রি করছি না আমি। ছবিটা তোমার এত পছন্দ যখন, তুমিই নাও।'

'হ্যাঁ, নির্দ্বিধায় নিয়ে যাও,' মিসেস রোজান বললেন। 'টিনা যখন তোমাকে দিয়ে দেবার কথা বলল আমাকে, আমি তখন নিনা হাওয়ার্ড, মিস ক্যারিনা হুপার আর মিস্টার ডেভিড কারনারসনকে ফোন করলাম। ওদেরকে আমি সব বুঝিয়ে বলেছি। ছবিটা তোমাকে দিয়ে দিতে কারও কোন আপত্তি নেই।'

এতক্ষণে হাসি ফুটল মুসার মুখে। 'যাক, ভালই হলো। ছবিটা ঘরের দেয়ালে ঝোলাতে আর কোন দ্বিধা থাকবে না আমার মনে। থ্যাংক ইউ, টিনা।'

'ইউ আর ওয়েলকাম,' হাসতে হাসতে বলল টিনা। 'আমি জানি, ভাল হাতেই যাচ্ছে আমার প্রিয় ছবিটা। যত্নেই থাকবে। যদি কখনও দেখতে ইচ্ছে করে আমার, সহজেই গিয়ে দেখে আসতে পারব তোমাদের বাড়িতে।'

'তবে আমার মনে হয় না, তুমি আর দেখতে যাবে ওটা,' মিসেস রোজান বললেন। 'বিদায় করে দেয়ার পর, নতুন ঘরের চেহারা দেখে দু'দিনেই ভুলে যাবে ওটার কথা।...যাকগে, কিশোর, শোনো। কাল যে দশ ডলার বেশি হয়েছিল মনে আছে?'

'আরি, ওই টাকার কথা তো জিজ্ঞেস করতেই ভুলে গেছিলাম। ওটাও একটা রহস্য। মিলাতে পেরেছেন?'

'পেরেছি। ভুলটা আমিই করেছিলাম। ক্যালকুলেটরে যোগের ভুল। আসলে তিনশো ডলারই হওয়ার কথা। যাই হোক, কাল তিনশো, আজও তিনশো। ছয়শো। দু'দিনে খুব ভাল ব্যবসা, কি বলো?' ধন্যবাদ দিলেন সবাইকে। হেসে বললেন, 'অনেক উপকার করলে আমার।'

'না না, ও আর কি,' মুসা বলল। 'আমরাও তো প্রচুর মজা পেয়েছি। আর কিশোরের তো কথাই নেই। এমন একখান রহস্য পেয়ে গেল।' বন্ধুদের দিকে তাকাল সে। 'তো? কে কে আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ি যাবে? ছবি টানানোর উদ্বোধন করব।'

রবিন জিজ্ঞেস করব, 'উদ্বোধনটা কি খালি-মুখে? না খাওয়া সহ?'

'কী কাণ্ড! রবিন মিলফোর্ডও খাওয়ার কথা বলে!'

'কেন, আমি কি না খেয়ে থাকি নাকি?'

'না, তা বলিনি। চলো, খাওয়াব,' হেসে জবাব দিল মুসা। 'ওই যে হাড়ুম-

ধুড়ুম না কি একটা আইসক্রীম খেয়ে এলাম, ওটাতে চলবে?'

'হাড়ুম-ধুড়ুম' আইসক্রীমের নাম শুনে হাসতে লাগল সবাই। মিসেস রোজানও না হেসে পারলেন না।

দল বেঁধে গেটের দিকে এগোল তিন গোয়েন্দা। সঙ্গে টিনা ও অনি। সবাই চলেছে মুসাদের বাড়িতে। মুসার ঘরে ছবি টানানো দেখতে।

গেটের বাইরে এসে টিনা বলল, 'তোমরা এগোও। আমি একদৌড়ে গিয়ে বাড়ি থেকে ছবিটা নিয়ে আসি।'

*

সে-রাতে নিজের ঘরে ডেস্কে বসে আবার লাল নোটবুকটা টেনে নিল কিশোর। পাতা খুলে সোনালি 'কে' অক্ষর লেখা কলমটা দিয়ে মন্তব্য লিখল: পুরানোকে বিদায় দিতে মাঝে মাঝে খুবই কষ্ট হয় আমাদের, কিন্তু না দিলে নতুনকে পাওয়া যাবে না। অপ্রয়োজনীয় কিংবা কাজে লাগবে না আর, এমন জিনিস বিদায় করে দেওয়াই উচিত। মনে রাখতে হবে, নতুন জিনিস পাওয়ার মধ্যে অনেক বেশি আনন্দ, একটা জটিল রহস্য সমাধানের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। 'ছবি রহস্য' কেসের এখানেই সমাপ্তি টানলাম। কিশোর পাশা। সময়: রাত ১১-৫৯ মিনিট। তারিখ: ৫ এপ্রিল, ২০০৪ সাল।

***

[এ বইটি 'গোয়েন্দা রাজু' সিরিজে 'সুরের নেশা' নামে ছাপা হয়েছিল। এখন 'তিন গোয়েন্দা' বানিয়ে 'সুরের মায়া' নামে ছাপা হলো। উল্লেখ্যঃ গোয়েন্দা রাজু সিরিজের লেখক 'আবু সাঈদ' রকিব হাসান-এর ছদ্মনাম।]

সুরের মায়া

এক

কিশোরদের গ্রীনহিলসের বাড়ি।

'অ্যাইই!' দেয়ালের ওপার থেকে ডাকল একটা পরিচিত কণ্ঠ। আনন্দে চেঁচাতে শুরু করেছে টিটু। ঝট করে মুখ তুলে তাকাল কিশোর আর মিশা।

'ও, মুসা,' খুশি হয়ে বলল কিশোর। 'এই টিটু, থাম। মনে হচ্ছে কয়েক যুগ ধরে দেখিসনি। মুসা, এসো। কোন খবর আছে?'

'আছে।' সাইকেল চালিয়ে সামনের গেট দিয়ে এসে ঢুকল মুসা। 'খুব ভাল খবর। মা আজ পুরো পাঁচ ডলার দিয়েছেন আমাকে। হিলি-ডাউনের মেলা দেখতে যাওয়ার জন্যে। যাবে নাকি?'

'যেতে তো ইচ্ছে করছে,' মিশা বলল। 'কিন্তু টাকা যে নেই। যা জমিয়েছি, সেগুলো খরচ করতে পারব না। ভাবছি, খালুর জন্মদিনে একটা উপহার কিনে দেব।'

মিশা মেরিচাচীর বোনের মেয়ে। বোন মারা গেছেন। মিশার বাবা আবার বিয়ে করেছেন। মিশাকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছেন নিঃসন্তান মেরিচাচী। বলেন, 'এইসব এতিমের দায়িত্ব নেয়ার জন্যেই খোদা আমাকে সন্তান দেননি!'

'টাকা আছে আমার কাছে,' মুসা বলল। 'অসুবিধে হবে না। কিন্তু একটা খারাপ খবরও আছে। বাবলিও যাচ্ছে মেলায়। তার সাথে যাবে নিনা। ইদানীং বেশি বেশি আমাদের বাড়িতে আসছে বিচ্ছু মেয়েটা।'

'যাক,' ঠোঁট উল্টে বলল কিশোর। 'এখন তো আর কোন কেস নেই আমাদের হাতে, রহস্যের কিনারা করতে যাচ্ছি না। তা কখন যাচ্ছি?'

'চায়ের পর। তখন বেশ ভিড় জমবে মেলায়। হাই স্ট্রীটের বাস স্টপেজে বিকেল পাঁচটায় দেখা হবে। বাবলি আর নিনার দিকে নজর দিয়ো না। টিটকারি মারলেও কান দেবে না। এমন ভাব দেখাবে যেন শোনইনি।'

'ঠিক আছে। লধশের অন্যেরাও কি যাচ্ছে?'

'টাকায় হবে কিনা জানতে চাইছ তো? বললাম না, পুরো পাঁচ ডলার আছে আমার কাছে। যদি বলো, সবাইকে খবরটা দিয়ে আসতে পারি।'

এক মুহূর্ত ভাবল কিশোর। তারপর ঘাড় কাত করল। 'বেশ। আমরাও দেখি, যে যা পারি নেব। একেবারে খালি হাতে যাব না। তা হলে ওই কথাই রইল,

বিকেল পাঁচটা।'

বেরিয়ে গেল মুসা।

'খালাকে জিজ্ঞেস করা দরকার,' মিশা বলল। 'মানা করবেন না, জানি। তবু অনুমতি নিয়ে রাখলে ভাল। চলো।'

মেরিচাচী মানা করলেন না। কিছু পয়সা দিতেও রাজি হলেন।

সারাক্ষণ ওদের সঙ্গে সঙ্গে থাকল টিটু। মুখের দিকে তাকিয়ে এমন ভাবে লেজ নাড়তে লাগল, হেসে ফেলল কিশোর। বলল, 'এ-ব্যাটাও যেতে চায়। বেশ, যাবি। মোটা হয়ে যাচ্ছিস। সাইকেলের সাথে দৌড়ালে চর্বি কিছু কমবে।'

আনন্দে ঘেউ ঘেউ শুরু করল টিটু।

'আজকাল তো আর মিটিং করতে দেখি না,' মেরিচাচী বললেন। 'তোদের লধশ ভেঙে গেল নাকি?'

'না না, ভাঙবে কেন?' তাড়াতাড়ি বলল কিশোর।

মেরিচাচী হাসলেন। 'ছুটির এক হপ্তা শেষ হয়ে গেল। এখনও কেক আর লেমোনেড চাইছিস না তো, তাই ভাবলাম গোয়েন্দাগিরি থেকে বুঝি মন উঠে গেল তোদের।'

'ভাঙেনি,' মিশা জবাব দিল। 'আসলে, তেমন রহস্যময় কিছু ঘটছে না। কেস না পেলে অযথা মিটিঙে বসারও কোন মানে হয় না। কী আলোচনা করব?'

'হুফ!' বলে কিশোর আর মিশার কথা সমর্থন করল টিটু।

'তোর তো সারাটা জীবনই ছুটি, টিটু,' কিশোর বলল, 'আরামেই আছিস। আমাদের মত এত-শত ঝামেলা নেই। স্কুলে যেতে হয় না, হোমওয়ার্কও করতে হয় না।'

আবার বলল টিটু, 'হুফ!' তবে এবার মুখ কালো করে। অপমান লেগেছে তার।

বিকেল পাঁচটায় সাইকেল নিয়ে বাস স্টপেজের কাছে দেখা করল ছেলেমেয়েরা। প্রথমে পৌঁছল কিশোর আর মিশা। ওদের পর পরই এল রবিন। তারপর ডলি আর অনিতা, একসঙ্গে। ওদের পিছনে এল বব।

'ছ'জন হলাম,' মিশা বলল। 'বাকি রইল আসল জন...'

'ওই যে, এসে পড়েছে,' বব বলল।

পথের মোড়ে দেখা গেল মুসাকে। সাথে নিনা আর বাবলিও রয়েছে।

কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মুসা, 'বাবলির জন্যে দেরি হয়ে গেল। টাকার ব্যাগ খুঁজে পাচ্ছিল না...'

'দেরিটা তো তুই করালি,' মুখ ঝামটা দিয়ে বলল বাবলি। 'সাইকেলের চাকায় পাম্প করলি। এখন আমার দোষ দিচ্ছিস।'

নিনাও বাবলির কথায় সায় জানাল।

শুরুতেই লধশের সবার মেজাজ বিগড়ে দিল ঝগড়াটে মেয়ে দুটো।

'চলো,' গম্ভীর হয়ে বলল কিশোর। 'এখানে দাঁড়িয়ে অযথা বকবক না করে মেলায় যাই।'

মেলা ওখান থেকে মাইল দেড়েক দূরে। একটা পাহাড়ের গোড়ায় বিরাট মাঠের মধ্যে বসেছে। অসংখ্য তাঁবু আর অস্থায়ী ঘর দেখা যাচ্ছে। নানা ধরনের নানা বর্ণের পতাকা উড়ছে তাঁবুগুলোর মাথায়।

মাঠের এককোণে এসে একটা জায়গা বেছে নিয়ে সাইকেলগুলো রাখল ওরা। টিটুকে নির্দেশ দিল কিশোর, 'টিটু, পাহারায় থাক। দেখিস কেউ যেন ছুঁতে না পারে।'

'সাইকেল পাহারা দেয়ার চেয়ে মেলা দেখতে যাওয়ার ইচ্ছেই বেশি ছিল টিটুর। কিন্তু মনিবের আদেশ মানতেই হবে।' অসহায়ের মত কয়েকবার লেজ নেড়ে সাইকেলগুলোর কাছে বসে পড়ল সে।

ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে সবাইকে উদ্দেশ্য করে কিশোর বলল, 'চলো।'

দুই

চমৎকার মেলা বসেছে।

নাগরদোলাটা দেখে বব বলল, 'ভাল জিনিস। চড়ব নাকি?'

'না,' ডলি বলল। 'আমার মাথা ঘোরে।'

'আমারও,' নিনা বলল।

'এলে কেন তা হলে?' নিনাকে বলল মুসা। 'বাড়িতে বসে থাকলেই পারতে। এটা করলে মাথা ঘোরে, ওটা করলে ঠ্যাঙ কাঁপে, আবার মেলা দেখতে এসেছে! যত্তসব! হুঁহ্!'

ঘুরে ঘুরে নানারকম খেলা দেখতে লাগল ওরা। কোথাও ম্যাজিক চলছে, কোথাও ঘোড়া কিংবা কুকুরের খেলা। এক জায়গায় লোককে হাসিয়ে মারছে দুজন ভাঁড়। আরেক জায়গায় আগুন গিলে ফেলার খেলা দেখাচ্ছে একজন। গালভরা একটা নাম রেখেছে নিজের, 'অগ্নিমানব'।

খেলা দেখে আর মজার মজার খাবার কিনে সব পয়সা শেষ করে ফেলল ওরা। একজায়গায় দেখা গেল একটা উনুনে জিনজারব্রেড তৈরি করছে মোটা এক জিপসি মহিলা। বাতাসে লোভনীয় গন্ধ। পায়ে পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেল ওরা।

'কিনবে?' জিজ্ঞেস করল মহিলা।

'ইচ্ছে তো করছে,' কিশোর বলল, 'কিন্তু পয়সা নেই যে। সব খরচ করে ফেলেছি।'

'নাও,' ওদের দিকে কয়েকটা জিনজারব্রেড বাড়িয়ে দিয়ে বলল মহিলা.

'খেয়ে দেখো। দাম দিতে হবে না।'

'ধন্যবাদ,' কিশোর বলল। 'এমনি নেব না। পয়সা হলে আরেকদিন এসে কিনে খেয়ে যাব।'

কিশোরের আত্মসম্মানবোধ দেখে খুশি হলো মহিলা। তার সঙ্গে আলাপ জমাল। কাছেই একটা প্র্যাম-এ শুয়ে আছে একটা শিশু। প্র্যামটা পুরানো, ভাঙা। কিন্তু তাতে শোয়া বাচ্চাটা খুব সুন্দর, ফুটফুটে। কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসল কয়েকবার।

এগিয়ে গিয়ে ওকে আদর করতে লাগল মিশা। তারপর মহিলার দিকে ফিরে বলল, 'বাচ্চা নিয়েই মেলার সঙ্গে ঘুরে বেড়ান?'

'না। পাহাড়ের ধারে একটা কুঁড়ে আছে আমাদের,' মহিলা জানাল। 'আমার স্বামী মেলার সঙ্গে থাকে। আমি বাড়িতে থাকি তখন। তবে মেলাটা যখন বাড়ির কাছাকাছি কোথাও আসে, আমিও তখন যাই। জিনজারব্রেড বানিয়ে বিক্রি করি। তাতে কিছু বাড়তি পয়সা আসে।' কয়েকজন লোককে এদিকে আসতে দেখে গলা চড়িয়ে বলতে লাগল সে, 'আসুন আসুন, ভাল জিনজারব্রেড! গরম গরম খাবেন! একেবারে চুলা থেকে নামিয়ে দেব! দামও খুব কম, একবার খেয়েই দেখুন, জিভে স্বাদ লেগে থাকবে...'

'এসো,' ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে বন্ধুদেরকে বলল কিশোর, 'এবার যেতে হয়। আরেকবার মেলাটা ঘুরে দেখেই বাড়ি রওনা হব।'

'আরও কিছুক্ষণ থাকব না?' মিশা বলল। 'আলো জ্বলাটা দেখে যেতাম। মেলায় আলো জ্বললে নাকি সবচেয়ে সুন্দর লাগে, দেখার মত জিনিস। দিনের আলোয় সেটা বোঝা যায় না।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ,' বাবলি একমত হলো। 'আমি আর নিনাও থাকতে চাই। আলোই যদি না দেখলাম, মেলার আর দেখলামটা কী? কী বলিস, নিনা?'

'ঠিক।' খরগোশের মত নাক কুঁচকে কুঁচকে কথা বলে নিনা অনেক সময়, দেখে হাসি পায় মিশার। 'আলো জিনিসটা বড় রোমান্টিক লাগে আমার কাছে। কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে তখন। বাবলি, ওরা যেতে চাইলে চলে যাক, আমরা থাকি।'

'আজকাল ভাল কবিতা লিখছে নিনা,' বাবলি বন্ধুর প্রশংসা করে বলল। 'দুএকটা শুনতে চাও?'

আতঙ্কিত হয়ে নিনার দিকে তাকাল ছেলেরা।

তাড়াতাড়ি হাত নাড়ল মুসা, 'না না, আজ থাক। আরেকদিন শুনব।'

'যেতে হবে এবার আমাদের,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল কিশোর, আর একমুহূর্ত নিনার সঙ্গে কাটাতে রাজি নয় সে। ইস্কুলে নিনার কবিতা শুনেছে একদিন সে। অনেক কষ্টে হাসি চেপেছে। 'তোমরাও যাচ্ছ আমাদের সাথে,' নিনা আর বাবলিকে বলল

সে। 'আমাদের সঙ্গে এসেছ, সঙ্গেই ফিরবে। তোমাদেরকে একা রেখে যাচ্ছি না আমরা। বাড়ি গিয়ে বিপদে পড়ে যাবে তা হলে মুসা।'

'তোমার কথায় যাব নাকি?' বেঁকে বসল বাবলি। 'আমরা লধশের কেউ নই। আমাদের ওপর জোর করার কোন অধিকার তোমার নেই।'

'আমার আছে,' জোর দিয়ে বলল মুসা, 'কারণ তুই আমার বোন। চাচাত বোন হলেও বোন তো। তোকে দেখেশুনে রাখতে বলে দিয়েছেন আমাকে মা।

আর কিছু বলতে পারল না বাবলি। মুসার কথা না শুনলে এখন বাড়ি গিয়ে চাচীর বকুনি শুনতে হবে।

সাইকেলগুলোর কাছে এসে দেখল, কড়া পাহারা দিচ্ছে টিটু। কোন ছেলেমেয়েকে সাইকেলের ধারেকাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না।

সাইকেলে চড়ে বাড়ি ফিরে চলেছে দলটা, হঠাৎ পাহাড়ের উপর একটা আলো চোখে পড়ল ববের। ওদের বাঁ দিকে।

'আরে!' চিৎকার করে উঠল সে। 'আগুন! আগুন লেগেছে নিশ্চয়!'

'তাই তো! মনে হয় কোন বাড়িতে!' কিশোর বলল। 'চলো তো দেখি। কোনও সাহায্য করতে পারি কিনা। আগে দমকলকে ফোন করা দরকার। তোমরা যাও। আমি ফোন করে আসছি।'

তাড়াতাড়ি বুদের কাছে এসে সাইকেল স্ট্যান্ডে তুলে ভিতরে ঢুকল কিশোর। বুদের ভিতর থেকেই দেখল সাইকেল নিয়ে তাড়াহুড়া করে মাঠ পেরোচ্ছে দলের অন্যেরা।

একবার রিঙ হতেই ওপাশ থেকে রিসিভার তুলে নেওয়া হলো। জরুরি গলায় কিশোর বলল, 'হ্যালো, ফায়ার স্টেশন? হিলি-ডাউন হিলে আগুন লেগেছে। মনে হচ্ছে ছড়িয়ে পড়বে। জলদি আসুন। রাখলাম।'

তিন

বুদের বাইরে বেরিয়ে আবার সাইকেলে চাপল কিশোর। দ্রুত প্যাডাল করে চলল আগুনের দিকে। কাছে এসে চোখ বড় বড় করে দেখল, যেটাতে আগুন লেগেছিল সেটা পুড়ে প্রায় ছাই হয়ে এসেছে।

'কি ওটা? বাড়ি?' কিশোর বলল। আগুনের আঁচ এসে লাগছে চোখেমুখে। 'ভিতরে কেউ নেই তো?'

'শুধু একটা বিড়াল দেখলাম বেরিয়ে যাচ্ছে,' বব জানাল। 'বাড়িটা ছোট, কিশোর। দমকলকে পেয়েছ?'

'পেয়েছি। আসছে। তবে আসতেও সময় লাগবে। এই মিশা, কাঁদছ কেন?

বাড়িতে মানুষ-টানুষ আছে বলে মনে হয় না।'

'বাড়িটা নিশ্চয় খুব ছোট,' রবিন বলল। আগুনে কাঠ পোড়ার বিচিত্র খড়খড় ফুটফাট শব্দ ভেসে আসছে। 'দেখছ না কত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল।'

'চলো, আরও কাছে গিয়ে দেখি,' বলে এগোল কিশোর। 'মুসা, এসো।'

পোড়া বাড়িটার আরও কাছাকাছি গিয়ে চারদিকে চক্কর মেরে দেখতে লাগল দুজনে। ভিতরে কেউ আছে কিনা দেখবার চেষ্টা করছে। কিন্তু আগুন ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। কাঠ পুড়ছে, ধুপুত-ধাপুত করে ভেঙে পড়ছে চালার কাঠামো।

এই সময় শোনা গেল দমকলের ঘণ্টা। 'সরো, পথ ছাড়ো' বলে হুঁশিয়ার করতে করতে যেন মহাবেগে ধেয়ে আসছে যন্ত্রদানব।

'আসছে!' রবিন বলল। 'আরেকটু তাড়াতাড়ি করতে পারছে না! এসে তো পাবে শুধু ছাই, নেভাবে আর কি?'

সরু কাঁচা রাস্তা ধরে জোরে ছুটতে পারছে না দমকলের গাড়ি। তবু যথাসাধ্য চেষ্টা করছে তাড়াতাড়ি পৌঁছানোর।

কাছে এসে থামল গাড়ি। লাফ দিয়ে নামল একজন ফায়ারম্যান। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল ছেলেমেয়েদের, 'এই, কাছে কুয়াটুয়া আছে, জানো?' লম্বা হোসপাইপ খুলতে আরম্ভ করে দিয়েছে ইতিমধ্যেই।

'ওদিকে একটা ঝর্না আছে,' হাত তুলে দেখাল মুসা।

সেদিকে দৌড় দিল লোকটা। আরও লোক নামল গাড়ি থেকে। নেমেই ব্যস্ত হয়ে উঠল। মিনিটখানেকের মধ্যেই পানি ছিটানো শুরু করল আগুনের উপর।

গায়ে পানি পড়তেই হিসিয়ে উঠল আগুন।

'আরিব্বাপরে!' কেঁপে উঠল মিশা। সিনেমায় দেখা ড্রাগনের কথা মনে পড়ছে। 'ড্রাগনের মত ফুঁসছে!'

'ভিতরে কাউকে দেখেছ?' জিজ্ঞেস করল একজন ফায়ারম্যান।

'না,' জবাব দিল কিশোর। 'তবে আমরা যখন এসেছি, বাড়িটা তখন অনেকখানি পুড়ে গেছে। ভিতরে কেউ থাকলেও তার বাঁচার আশা ছিল না তখন। একটা বিড়াল ছাড়া আর কাউকে বেরোতে দেখিনি।'

'বাচ্চা-টাচ্চা ঘুমিয়ে থাকতে পারে,' লোকটা বলল। 'কার বাড়ি, জানো?'

ওরা কেউ জানে না। হঠাৎ কাকে যেন ছুটে আসতে দেখা গেল। সামনে কী একটা ঠেলে নিয়ে আসছে।

'আরে, ওই মহিলা!' চেঁচিয়ে উঠল মিশা। 'মেলায় যে জিনজারব্রেড বিক্রি করছিল! ও বলল না, পাহাড়ের কাছে থাকে? নিশ্চয় ঘরটা ওই মহিলার!'

কাছে চলে এল মহিলা। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসবে যেন কোটর থেকে। ঝাঁকুনি লেগে আরেকটু হলেই প্র্যাম থেকে ছিটকে পড়ে গিয়েছিল বাচ্চাটা।

'হায় হায়, আমার টুকি!' আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠল মহিলা। 'ওকে ফেলে গিয়েছিলাম!'

'কাউকে তো দেখলাম না আমরা,' বলল চীফ ফায়ারম্যান।

বুক কেঁপে উঠল ছেলেমেয়েদের। তা হলে কি পুড়ে মারা পড়ল মহিলার টুকি!

'টুকি! টুকি! টুকি!' কপাল চাপড়ে বিলাপ শুরু করল মহিলা। 'কোথায় তুমি, টুকি, বাছা আমার!'

তারপর সবাইকে স্বস্তির পরশ বুলিয়ে কথা বলল একটা ভয়ার্ত কাঁপা কাঁপা কণ্ঠ, 'মা! মা!'

'আছে!' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মহিলা। গাল বেয়ে চোখের পানি গড়িয়ে পড়ল। 'কোথায় তুই, টুকি?'

আবার সাড়া এল।

'নিশ্চয় ঝোপের ভিতরে গিয়ে লুকিয়েছে। ভয়ে।' প্র্যাম থেকে বাচ্চাটাকে তুলে কোলে নিল মহিলা। রওনা হলো একটা ঝোপের দিকে। পোড়া কুটিরটা থেকে একটু দূরে ওটা। 'টুকি? আর ভয় নেই। আমি এসে গেছি।'

তারপর হঠাৎ করেই যেন আবিষ্কার করল ছেলেমেয়েরা, জনতার ভিড় জমে গেছে তাদের আশেপাশে। আগুন দেখে মেলা ফেলেই ছুটে এসেছে সবাই। মহিলার স্বামীও কি আছে ওদের মধ্যে? ছেলেমেয়েদের মনে হলো, আছে। থাকাটাই স্বভাবিক। থাকলে মহিলাকে সান্ত্বনা দিতে পারবে।

'ঘর তো শেষ,' মিশা বলল। 'আজ রাতে কোথায় থাকবে ওরা?'

'ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে। কারও গোলাবাড়িতে গিয়ে থাকতে পারবে,' বলল একজন ফায়ারম্যান। 'কেউ না কেউ নিয়ে যাবেই।' আগুন নেভানো শেষ। হোস পাইপ গোটাচ্ছে সে। 'কেউ যে পুড়ে মরেনি এটাই বেশি। তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ, ফোনটা করেছ বুদ্ধি করে।'

'ইস্, মেলায় পয়সাগুলো যদি খরচ করে না ফেলতাম!' মনে মনে আফসোস করল মুসা, 'তা হলে মহিলাকে এখন দিয়ে দেয়া যেত। সাহায্য হতো ওদের।'

দুজন পুলিশের লোক এসে হাজির হলো। একজন নোটবুক বের করে ঘটনার বিবরণ লিখে নিতে শুরু করল। আরেকজন সরিয়ে দিতে লাগল দর্শকদের। 'চলে যান, প্লীজ। আগুন তো নিভে গেছে। আর কী দেখবেন? যান। এই যে, আপনিও যান। আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না।'

ছেলেমেয়েদের কাছে এসে দাঁড়াল সে। 'তোমরাই দমকলকে ফোন করেছিলে? ঠিক কাজটাই করেছ, বুদ্ধি আছে। তা, তোমরাও এখন যাও। আর থাকার দরকার নেই। আমরা এসে গেছি, এখন যা করার আমরাই করব।'

'ওদের কী হবে?' যাদের বাড়ি পুড়েছে তাদের কথা জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'আগুন তো সব শেষ করে দিয়েছে ওদের।'

'বললাম তো, ওদেরকে আমরা দেখব,' বেশ জোরের সঙ্গে বলল পুলিশম্যান। 'সব ঠিক হয়ে যাবে সাধারণ একটা ঘর, নিশ্চয় তেমন কিছু ছিল না ভিতরে। দয়া করে এখন বাড়ি যাও তোমরা। আমাদের কাজ করতে দাও।'

আবার ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে রওনা হয়ে গেল দমকলের গাড়ি। যার যার বাড়ির পথ ধরেছে জনতা।

সাইকেল ঠেলে নিয়ে এগোল ছেলেমেয়েরা। তাদেরকে অনুসরণ করল টিটু। বুঝতে পারছে না এই রোমাঞ্চকর জায়গা ছেড়ে কোথায় চলেছে ওরা। বাড়ি? নাকি আর মজার কোথাও?

সাইকেলে চড়ল ওরা। সবাই নীরব। এমন কী বাচাল বাবলি পর্যন্ত চুপ হয়ে গেছে।

অস্বস্তিকর এই নীরবতা ভঙ্গ করল অবশেষে নিনা, 'ওরকম আগুন জিন্দেগীতে দেখিনি আমি! বাপরে বাপ! দমকলের গাড়িকেও আগুন নেভাতে দেখিনি কখনও! আজ দেখলাম! কী সাংঘাতিক ব্যাপার! আমি কখনও...'

'চুপ করো তো!' ধমক লাগাল মুসা। 'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন খুব মজা পেয়েছ দেখে। ওই মহিলাটার কথা একবার ভেবেছ?'

'কিশোর,' বব বলল, 'আমার খুব খারাপ লাগছে। একটা মিটিং ডাকি, চলো। মহিলাকে আমাদের সাহায্য করা দরকার। পুলিশের কথায় আমি ভরসা রাখতে পারছি না। কাল সকাল দশটায়, কী বলো?'

'ঠিকই বলেছ,' একমত হলো কিশোর। 'এই, কাল সকাল দশটায় ছাউনিতে হাজির হবে সবাই। মিটিং।'

'আমি আর বাবলিও!' বিশ্বাস করতে পারছে না নিনা। সে মনে করেছে ওদেরকেও বলা হয়েছে।

'না,' তাকে ফাটা বেলুনের মত চুপসে দিল কিশোর, 'তোমরা না। শুধু লধশেরা আসবে। বাবলি, মনে থাকে যেন কথাটা। নইলে শেষে টিটু যদি তোমাদের ঠ্যাং কামড়ে দেয়, আমি কিছু জানি না।'

চার

পরদিন সকালে দশটা বাজবার পাঁচ মিনিট আগে এসে ছাউনিতে ঢুকল মিশা আর কিশোর।

'সঙ্কেতটা সবার মনে থাকলেই হয়,' কিশোর বলল। 'অনেক দিন ব্যবহার করা হয় না। ভুলেও গিয়ে থাকতে পারে।'

বাইরে ডেকে উঠল টিটু। তারমানে কেউ এল।

প্যায়ের আওয়াজ শোনা গেল। দরজায় টোকা পড়ল। নরম গলায় বলল, 'ঘেউ!'

'ভিতরে এসো,' দরজা খুলে দিয়ে বলল কিশোর। 'সঙ্কেত মনে আছে তা হলে।'

'আছে। ডায়রিতে লিখে রেখেছিলাম,' বব বলল।

আবার ডেকে উঠল টিটু। আবার টোকা পড়ল দরজায়।

'সঙ্কেত বলো,' কিশোর অনুরোধ করল।

'ঘেউ! ঘেউ!' অনিতার পর-পর ডলি বলল।

দরজা খুলে দিয়ে ডলির দিকে চেয়ে বলল কিশোর, 'নিশ্চয় তুমি ভুলে গিয়েছিলে। অনিতাকে বলতে শুনে বলেছ। ঠিক আছে, এসো।'

দরজায় টোকা পড়ল। কিশোর সঙ্কেত জানতে চাইলে রবিন জবাব দিল, 'ভুলে গিয়েছি, কিশোর! সরি! অনেক দিন হয়ে গেছে তো...'

'সরি,' কিশোর জবাব দিল। 'সঙ্কেত বলতে না পারলে ঢুকতে দিতে পারব না। নিয়ম সবার জন্যে এক।'

মুসাও এসেছে। সঙ্কেত তারও মনে নেই। রাগ করে বলল, 'এ-ভাবে কথা বোলো না, কিশোর। অনেক দিনের কথা, ভুলে গেলে কী করব? আর বাবলির জ্বালায় তো ডায়রিতে লিখে রাখারও জো নেই, কখন দেখে ফেলবে।...এই টিটু, ওদিকে কি...'

বোধহয় ঝোপের ভিতরে ইঁদুর-টিঁদুর দেখতে পেয়ে কান খাড়া করে ফেলেছে টিটু। হঠাৎ চিৎকার শুরু করল, 'ঘেউ! ঘেউ! ঘেউ!'

'পড়েছে, মনে পড়েছে!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'সঙ্কেতটা হলো ঘেউ!'

'হ্যাঁ, ঠিক, ঘেউ!' মুসা বলল। 'এবার আর আমাদেরকে ঢুকতে না দিয়ে পারবে না!'

'নাহ্, সঙ্কেতটা বদলাতে হবে!' বিরক্ত হয়ে দরজা খুলে দিল কিশোর। 'সব ফাঁস হয়ে যাবে নইলে।'

ইঁদুর নয়, বাবলি আর নিনাকে দেখে চিৎকার করছে টিটু। খিলখিল হাসি শোনা গেল ওদের। তারপর সুর করে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'ঘেউ-ঘেউ! ঘেউ-ঘেউ!'

'এই বাবলি!' দরজায় দাঁড়িয়ে কড়া ধমক লাগাল মুসা। 'তোদেরকে না আসতে মানা করে দিয়েছি! তা-ও এলি কেন?'

'ভিতরে এসো,' বলে মুসাকে টেনে ভিতরে নিয়ে এসে দরজা লাগিয়ে দিল কিশোর। চেঁচিয়ে টিটুকে আদেশ দিল, 'টিটু, ধর দুটোকে বাগানের মধ্যে ধরতে পারলে দিবি কামড়ে। তারপর যা হয় হবে।'

কামড় খাওয়ার জন্য বসে রইল না নিনা আর বাবলি। দিল দৌড়। একছুটে

একেবারে বাগানের বাইরে।

গোল হয়ে বসল সবাই। আলোচনার জন্য সবে মুখ খুলতে যাবে কিশোর, এই সময় আবার ঘেউ ঘেউ করে উঠল টিটু।

'আবার কে এল!' বলে দরজার দিকে এগোল কিশোর। 'এই টিটু, কে রে?' দরজা খুলল সে। 'আরে, টমচাচা, তুমি কোত্থেকে?'

টম হলো ওপাড়ার শেফার্ডদের মাইনে করা রাখাল। মাঝে মাঝে দরকার পড়লে এটা-ওটা চাইতে আসে কিশোরদের বাড়িতে। লম্বা তালপাতার সেপাই, সাদা চুল। বলল, 'এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম। ভাবলাম তোমার চাচার সঙ্গে দেখা করে যাই। মিস্টার পাশা আছেন?'

'না, নেই তো। কেন?'

'একটা দরকার ছিল।'

'কী দরকার, আমাকে বলে যাও। চাচা এলে বলব।'

'কাল রাতে হিলি-ডাউনে আগুন লেগেছিল, নিশ্চয় শুনেছ। জ্যাক মারফির কুঁড়েটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। থাকার জায়গা নেই ওদের...'

'জানি,' কিশোর বলল। 'দমকলকে কাল আমিই ফোন করেছিলাম।'

'তাই নাকি? তা হলে তো তুমি সবই জানো। আজ সকালে জ্যাকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ভেঙে পড়েছে বেচারা। ওর অবস্থা দেখে খুব খারাপ লাগল আমার।'

'তা চাচাকে কী বলতে এসেছিলে?'

'আমি যেখানে থাকি, সেই কুঁড়েটার কাছে তোমাদের একটা ভাঙা ক্যারাভান অনেকদিন ধরে পড়ে আছে না, আপাতত জ্যাক বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে ওটাতে মাথা গুঁজতে পারে। অবশ্যই যদি মিস্টার পাশা অনুমতি দেন। ওদের তো যাওয়ার কোন জায়গা নেই।'

'ঠিক আছে, চাচাকে বলব,' কিশোর বলল। 'আমার মনে হয় মানা করবেন না। পড়েই তো আছে।'

'খালাকে জিজ্ঞেস করলেই পারি,' পাশ থেকে বলে উঠল মিশা। 'কিশোর, চলো।'

কিশোর আর মিশা রওনা হতেই দলের অন্যেরাও বেরিয়ে পড়ল ঘর ছেড়ে। টিটু আর রবিনও চলল সঙ্গে সঙ্গে। বাগানের একধারে লেটুস লাগানো হয়েছে, সেগুলোতে পানি দিচ্ছিলেন মেরিচাচী, দলটাকে আসতে দেখে অবাক হয়ে ঘুরে তাকালেন। 'আরে, টম যে, কখন এলে?'

'এই তো। কেমন আছেন, ম্যা'ম?'

'ভাল। তোমাদের কী খবর?'

কেন এসেছে খুলে বলল টম। মন দিয়ে শুনলেন মেরিচাচী। তারপর

বললেন, 'ঠিক আছে, থাকুক ওটাতে। আমি কিশোরের চাচাকে বলব। অসুবিধে হবে না। যাও, জ্যাককে থাকতে বলে এসো।'

'ঠিক আছে, ম্যা'ম,' খুশি হয়ে বলল টম। 'এখুনি যাচ্ছি। আমার একটা পুরানো কম্বল আছে, টেবিল আছে, দিয়ে দেব ওদেরকে। ব্যবহার করুক।'

'দেখি, আমরাও কিছু দিতে পারি কিনা,' বলে কিশোরের দিকে ফিরলেন মেরিচাচী। 'কিশোর, তোদের মিটিঙে আমাকে থাকতে দিবি আজ? কথা আছে।'

'নিশ্চয়, এসো না! তোমাকে মিটিঙে পেলে খুশিই হব আমরা!'

পাঁচ

সবাই ঢুকবার পর দরজা লাগিয়ে দিল কিশোর। একটা বাক্স ঝেড়েঝুড়ে চাচীকে বসতে দিল মুসা।

'সঙ্কেত যে জিজ্ঞেস করিসনি, বেঁচেছি,' হেসে বললেন চাচী। 'সঙ্কেত জানি না।'

'তোমার সঙ্কেত লাগবে না,' মিশা বলল। 'আমাদের গোপন কথা তো আর কারও কাছে ফাঁস করে দেবে না। তোমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করি আমরা। তাই না?' অন্যদের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল সে।

সবাই একমত হলো মিশার সঙ্গে। এই মেরিচাচীকে পছন্দ করে সবাই।

আগের রাতে আগুন লেগে জ্যাকদের ঘরছাড়া হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা শুরু করল ওরা।

'মেলায় কাজ করে জ্যাক,' কিশোর বলল। 'মেলা যেখানেই যায়, সে-ও যায়। তার বউ বাড়িতে থাকে তখন। মেলাটা যখন বাড়ির কাছাকাছি আসে তার বউ গিয়ে সেখানে জিনজারব্রেড বিক্রি করে কিছু বাড়তি আয়ের জন্যে। এত গরীব, তা-ও কাল আমাদের কাছে পয়সা নেই শুনে বিনে পয়সায়ই খেতে দিতে চেয়েছিল।'

'তারমানে মহিলাটা খুব ভাল,' চাচী বললেন।

'তার একটা বাচ্চা আছে,' ডলি বলল, 'খুব ছোট। প্র্যামে করে মেলায় নিয়ে যায়।'

'মেয়ে বাচ্চাটার বড় একটা ছেলেও আছে,' মিশা জানাল। 'নাম টুকি। ও ছিল বাড়িতে। কাল রাতে ঘরে আগুন লাগলে বেরিয়ে গিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসে ছিল।'

'এ-সব কথা কাল রাতেই শুনেছি,' চাচী বললেন। 'এই তোমরা সবাই শোনো, যার যার বাড়ি গিয়ে মাকে সব কথা খুলে বলো। আমার কথা বলে বলবে,

আমরা সবাই ওদেরকে সাহায্য করতে চাই। দরকারী জিনিসপত্র...'

'বাসন-পেয়ালা-কেটলি এ-সবের কথা বলছেন?' ডলি বলল।

'হ্যাঁ। একটা পুরানো ম্যাট্রেসও লাগবে। বড়দের জন্যে ভাবি না, কিন্তু ওদের দুটো কচি বাচ্চা আছে। ক্যারাভানের শক্ত মেঝেতে ওদের ঘুমোতে অসুবিধে হবে। তা ছাড়া খাবারও দরকার।'

'সবাই মিলে দিলে খুব ভাল হবে। অনেক জিনিস জোগাড় করা যাবে,' কিশোর বলল। 'আমরা কী দিচ্ছি, চাচী?'

'ম্যাট্রেসটা আমরাই দিচ্ছি,' চাচী বললেন। 'চিলেকোঠায় একটা পড়ে আছে না, সেটা। পুরানো একটা চাদরও দেব। আরও দেখি কী দেয়া যায়।'

'এই,' মিশা বলল সবাইকে, 'তোমরা তা হলে বিকেলের মধ্যেই ফিরে এসো। যে যা পারো এনো।'

'হ্যাঁ,' কিশোর বলল, 'সবাই জিনিসপত্র নিয়ে এলে একটা লিস্ট করে ফেলব আমরা। এ-কাজে চাচীও সাহায্য করবেন আমাদের। করবে না, চাচী?'

'নিশ্চয়ই করব।'

'খুব মজা হবে,' অনিতা বলল। 'মালপত্র সব নিয়ে ক্যারাভানে চলে যাব আমরা। জ্যাকের বউ তখন না থাকলেই ভাল। ফিরে এসে যখন দেখবে ওগুলো খুব অবাক হয়ে যাবে।'

'ঠিক,' আনন্দে নেচে উঠল ডলির চোখ। 'চলো, সবাই বাড়ি চলে যাই এখন।'

'হ্যাঁ, তাই যাও,' কিশোর বলল।

সবাই উঠে দাঁড়াল। উত্তেজিত কণ্ঠে নানা কথা শুরু করে দিয়েছে। উত্তেজনা বুঝতে পেরেছে টিটু। লাফিয়ে এসে কিশোরের গায়ে পা তুলে দিল। 'আরে ব্যাটা,' ওকে আদর করে দিয়ে বলল কিশোর, 'তুইও সাহায্য করতে চাস নাকি?'

যার যার বাড়ি রওনা হলো ছেলেমেয়েরা। মিশা আর কিশোর এসে সোজা ঢুকল চিলেকোঠায়, ম্যাট্রেসটা দেখতে। গোল করে পাকিয়ে মোটা পলিথিন দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে ওটাকে। দুজনে মিলে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এল দরজার কাছে। ঠেলে দিল মইয়ের উপর। গড়িয়ে গিয়ে ধুপ করে নীচে পড়ল ম্যাট্রেসটা। কাছেই বসে ছিল টিটু। ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠে দিল দৌড়। সে বোধহয় ভেবেছে না জানি কী এসে গায়ের উপর পড়ল।

মেরিচাচী গিয়ে আলমারি খুললেন। দুটো চাদর বের করলেন। প্রায় নতুনই রয়েছে জিনিসগুলো। তারপর রান্নাঘরে এসে নিলেন একটা কড়াই, একটা কেটলি আর একটা জগ। পুরানো একটা তেলের চুলোও বের করলেন।

জিনিসগুলো হলঘরে বয়ে নিয়ে এল কিশোর আর মিশা।

আড়াইটা নাগাদ আবার এসে হাজির হলো লধশের সদস্যরা। নোটবুকে

লিখে নিয়ে এসেছে কে কী দেবে।

এইবার আর সঙ্কেত ভুল করল না কেউ। 'ঘেউ ঘেউ' করে ছাউনিতে ঢুকবার অনুমতি পেল সবাই।

একটা একটা করে লিস্ট নিয়ে পড়ল কিশোর। 'বাহ্,' বলল সে, 'ভাল ভাল জিনিস জোগাড় করেছ তো। চাদর আর কম্বল তো অনেক জমে গেল। চলো, চাচীকে গিয়ে দেখাই।'

লিস্টগুলো দেখলেন চাচী। পেন্সিল দিয়ে দাগ দিলেন যে সব জিনিস দু-তিনটে করে হয়ে গেছে সেগুলোর পাশে।

'ভাল,' অবশেষে বললেন তিনি। 'জিনিসগুলো সব বের করে রেখে এসেছ তো?'

'হ্যাঁ,' জানাল সবাই।

'বেশ। আমাদের ভ্যানটা নিয়ে বেরোব। তোমাদের বাড়ি থেকে জিনিসগুলো তুলে নিয়ে চলে যাব ক্যারাভানের কাছে। এসো।'

ভ্যানে করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে মালপত্র জোগাড় করবার মাঝে একটা আনন্দ আছে। খুব খুশি ছেলেমেয়েরা। অন্যকে সাহায্য করতে পারছে বলে গর্বিতও ওরা।

ছয়

'বাবলি আর নিনা এ-সব কথা কিছু জানে, মুসা?' মিশা জিজ্ঞেস করল।

'জানে। মাকে যখন বলছিলাম, তখনই শুনেছে। হিংসে করছে আমাদের। সাথে আসতে চেয়েছিল। আনিনি। বললাম, এতই যদি সাহায্য করার শখ, তা হলে নিজের পয়সা দিয়ে কিছু কিনে দিয়ে আসুক। আমাদের সঙ্গে কেন?'

'নিয়ে এলে পারতে,' মেরিচাচী বললেন। 'এখন তো আর কোন রহস্যের কিনারা করছ না তোমরা। কয়েকজন মানুষকে সাহায্য করতে যাচ্ছ। এ-সময় শত্রুতা থাকাটা ঠিক না।'

'কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না, চাচী,' কিশোর বোঝানোর চেষ্টা করল, 'বাবলিকে একবার দলে ঢোকালে আর ছাড়াতে পারব না। লেগেই থাকবে। লজ্জা-শরম কিছু নেই তো, হাজার বললেও যাবে না।'

মাঠের কাছে এনে ভ্যান থামালেন চাচী। দরজা খুলে লাফ দিয়ে নামল কিশোর। সরু একটা পায়েচলা পথ চলে গেছে পাহাড়ের দিকে। সেটা দিয়ে এগোলে পাশেই পড়বে টমের কুঁড়ে আর কিশোরদের ক্যারাভানটা।

পথটার দিকে একবার তাকিয়ে কিশোরকে গেট খুলতে বললেন মেরিচাচী।

বেড়া দেওয়া রয়েছে অনেকখানি জুড়ে গেটটা খুলে দিল কিশোর মাঠের মধ্যে গাড়ি নামালেন চাচী।

পায়েচলা পথের ধার দিয়ে ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগোল ভ্যান। ভিতরে ঝনঝন করে বাড়ি খাচ্ছে একসঙ্গে জড়ো করে রাখা তৈজসপত্র আর অন্যান্য জিনিস গদি আর চাদর-কম্বল ভাঁজ করে তার উপর যারা বসেছে তারা আরামেই আছে। ঝাঁকুনি ওদের গায়ে লাগছে না।

ক্যারাভানের পাশে চলে এল ভ্যান।

শব্দ শুনে কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে এসেছে টম। হেসে এগিয়ে এসে উঁকি দিল ভ্যানের জানালা দিয়ে ভিতরে।

'আপনিও এসেছেন, ম্যা'ম,' টম বলল। 'খুব ভাল হয়েছে। অনেক দয়া আপনার। আরিব্বাবা, কত জিনিস নিয়ে এসেছেন! ক্যারাভানে জায়গা হবে কিনা সন্দেহ।'

'ভিতরটা পরিষ্কার করেছ তো?' জিজ্ঞেস করলেন মেরিচাচী।

'হ্যাঁ। তবে এখনও ময়লা আছে।'

'ঠিক আছে। আমরা সবাই মিলে সাফ করে ফেলছি।' বলে লাফ দিয়ে নামল মিশা। ডাকল, 'খালা, নামো।'

সারাটা বিকেল ধরে কঠোর পরিশ্রম করল ওরা। ক্যারাভানের ভিতরে-বাইরে ধুয়েমুছে ঝকঝকে তকতকে করে ফেলল। দুটো তাক মেরামত করে ফেলল কিশোর, বাসন-পেয়ালা-কেটলি এ-সব রাখবার জন্য। কয়েকজনে মিলে ধরাধরি করে ক্যারাভানের মেঝেতে সুন্দর করে ম্যাট্রেস বিছিয়ে বিছানা পেতে দিল।

'এ-সব দেখে চমকে যাবে জ্যাক,' হেসে বলল বব।

ওদের সঙ্গে ছিল না টম, কাজে চলে গিয়েছিল। দুই ঘণ্টা পর ফিরে এসে অবাক। মাঠে বোধহয় ভেড়া পাহারা দিচ্ছিল তার বুড়ো কুকুরটা, এখন ওটাকে নিয়ে এসেছে সাথে করে। ওটার দিকে ছুটে গেল টিটু, খেলা করবার জন্য। আগে থেকেই পরিচয় আছে।

সেদিকে তাকিয়ে হেসে বলল কিশোর, 'টিটু, বেশি দূরে যাসনে। যেতে চাইলে ও তোকে একেবারে শেষ মাথায় নিয়ে চলে যাবে। ভেড়ার কাছে।' টমের দিকে ফিরল। 'টমচাচা, ক্যারাভানে থাকার কথা জ্যাককে বলেছ?'

'বলেছি। খুব খুশি হয়েছে ওরা। জ্যাক তো প্রথমে বিশ্বাসই করতে চায়নি। তা-ও তো ওকে জিনিসপত্রের কথা বলিইনি। দেখে থ হয়ে যাবে। যে-কোন সময় এসে পড়তে পারে।'

'আসুক। আমাদের কাজও শেষ। যাও না, তুমিও গিয়ে একবার উঁকি দিয়ে এসো না ভিতরে।'

ভিতরে উঁকি দিয়ে হাঁ হয়ে গেল টম। এত জিনিস! চেয়ে আছে তো আছেই.

নতুন আর ফেরায় না। 'পরিষ্কার করলে যে এ-রকম হয়ে যাবে আমিও ভাবিনি মিস্টার পাশা তো ক'দিন ধরেই আমাকে তাগাদা দিচ্ছিলেন ক্যারাভানটা ভেঙে ফেলতে। ফায়ারপ্লেসের লাকড়ি বানানোর জন্যে। অথচ কী সুন্দর কাজে লেগে গেল এখন···'

'ওই যে, জ্যাকরা আসছে,' বলে উঠল মিশা।

প্র্যামটা ঠেলতে ঠেলতে কাছে এসে দাঁড়াল জ্যাকের বউ। অবাক হয়ে তাকাতে লাগল সবার মুখের দিকে। হাসল। তবে কেমন যেন ফ্যাকাসে লাগল হাসিটা। চোখে অস্বস্তি। তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল টম। কোমল গলায় কথা বলতে লাগল, যেন ওই মহিলা তার প্রিয় কোন ভেড়া।

'এসো এসো,' ডাকল সে, 'ভয়ের কিছু নেই এখানে। আমরা সবাই তোমাদের বন্ধু। এই ক্যারাভানটায় তোমাদের থাকতে দিয়েছেন আমাদের এই ম্যা'ম,' মেরিচাচীকে দেখাল সে। 'কোন অসুবিধে হবে না তোমার। দেখো না ভিতরে চেয়ে।'

এগিয়ে গেলেন মেরিচাচী। 'কাল রাতে আগুন লাগার কথা সব শুনেছি। বাহ্, বাচ্চাটা তো খুব সুন্দর। কী নাম?'

কিন্তু টুকির মাথায় তিনি হাত রাখতেই ভয়ে ছুট দিল সে। দুহাত সামনে বাড়িয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে দৌড় দিয়েছে।

'ওর ব্যবহারে কিছু মনে করবেন না,' জ্যাকের বউ বলল। 'আস্ত ভীতু। তা ছাড়া কাল রাতে আগুন লাগার পর থেকে আরও ভয় পাচ্ছে। অচেনা মানুষকে বেশি ভয় পায়।'

ওকে ধরে আনতে যাচ্ছিল মিশা, মহিলার কথা শুনে থেমে গেল। ছেলেটার বয়েস আটের মত হবে, তবে বয়েসের তুলনায় শরীর বাড়েনি। ছোট দেখাচ্ছে। খানিক দূরে গিয়ে থেমে তাকিয়ে আছে বড় বড় কালো চোখ মেলে। শূন্য দৃষ্টি। কালো কোকড়া চুল নেমে এসেছে একেবারে ফোলা গালের উপর। সতর্ক রয়েছে। কেউ ধরে আনতে গেলেই আবার ছুটে পালাবে।

ভিতরে তাকিয়ে পুরো একটা মিনিট চুপ করে রইল জ্যাকের বউ। তারপর গদগদ কণ্ঠে বলল, 'এত্তো জিনিস! আমাদের ঘরে এর অর্ধেকও ছিল না। অনেক খাবারও এনেছেন! ম্যা'ম, কী বলে যে ধন্যবাদ দেব আপনাকে! কাল রাতে ঘর পুড়ে যাওয়ায় খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম। ঠাণ্ডাও পড়েছিল! দুচোখের পাতা এক করতে পারিনি সারাটা রাত।'

'আপনার সাহেব কখন আসবেন?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'জ্যাক? ওর কথা আর বোলো না। আমার চেয়ে বেশি দুঃখ পেয়েছে বেচারা। আগুনে এমন কিছু জিনিস নষ্ট হয়েছে আমাদের, যেগুলো আর কোনদিন কিনতে পারব না। আমার সেলাইর মেশিনটা গেছে। ব্যানজোটা পুড়েছে···

'ব্যানজো বাজাতে পারত নাকি?' রবিন বলল। 'খুব সুন্দর আওয়াজ। শুনতে আমার ভাল লাগে। ইস্, ভাল জিনিসটাই পুড়ে গেল। দুঃখ তো হবেই।'

বাচ্চাটা কাঁদতে আরম্ভ করল। প্র্যামের উপর ঝুঁকল মহিলা। 'খিদে পেয়েছে,' বলল সে। 'দুধও তো দেখলাম নিয়ে এসেছেন। সত্যি আমার কপাল ভাল, আপনাদের মত লোকের দেখা পেয়েছি। কী বলে যে ধন্যবাদ দেব!'

'চাচী, কাজ তো এখানে শেষ,' কিশোর বলল। 'চলো যাই। মিসেস মারফির কাজ আছে নিশ্চয়।'

'হ্যাঁ, চল,' বলে টমের দিকে ফিরলেন চাচী। 'টম, রোজ সকালে যেয়ো আমাদের বাড়িতে। কিছু দুধ দিয়ে দেব বাচ্চাটার জন্যে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে টম বলল, 'ঠিক আছে, ম্যা'ম, যাব।'

জ্যাকের বউকে বিদায় জানাল সবাই। বলল, কোন অসুবিধে হলে যেন জানায়, লজ্জা না করে। কোন জিনিসের দরকার হলে টমকে দিয়ে বলে পাঠায়।

পায়ে পায়ে টুকির কাছে এগিয়ে গেল কিশোর। নরম গলায় বলল, 'ভয় নেই, টুকি। আমরা তোমাদের বন্ধু। চলি, আবার দেখা হবে, অ্যাঁ?'

জবাব দিল না আজব ছেলেটা। বড় বড় চোখ মেলে তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে টুকি, অথচ কিশোরের মনে হচ্ছে তার দিকে নয়, অন্য কোনও দিকে দৃষ্টি তার। ছেলেটার চাহনি বড় অদ্ভুত!

সাত

ভ্যানে করে খুশিমনে ফিরে চলছে লধশরা। এই সময় চোখে পড়ল দূরে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে একজন লোক।

'ও-ই নিশ্চয় জ্যাক,' মিশা বলল। 'ক্যারাভান দেখে ও-ও তার বউয়ের মতই খুশি হবে।'

'আমার মনে হয় না,' চাচী বললেন। 'যত ভালই হোক, ওটা অন্যের জিনিস। তাদের নিজের ঘর নয়। তা ছাড়া এমন কিছু জিনিস হারিয়েছে ওরা, যা আমরা দিতে পারিনি। ওগুলো কিনতে কত বছর লেগেছে ওদের কে জানে। কিছু কিছু করে পয়সা জমিয়ে কিনেছে। নিজের বলতে এখন প্র্যামটা ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। ভাল কেন লাগবে?'

এ-ভাবে ভেবে দেখেনি মুসা। জিজ্ঞেস করল, 'ব্যানজোর দাম কি খুব বেশি?'

রবিন বলল, 'অনেক দাম।'

'আমাদের কি আর মিটিং ডাকার দরকার আছে?' অনিতা জানতে চাইল।

'হলে মন্দ হয় না,' কিশোর বলল। 'যদিও জরুরি আলোচনা নেই আমাদের,

তবু আলাপের অনেক বিষয় আছে।...আচ্ছা, এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে কী হবে? এখানে তো বেশ ভালই লাগছে। মাঠে নেমে হাঁটাহাঁটি করতে পারি আমরা, গল্প করতে পারি। চাচী, গাড়িটা একটু থামাবে?'

গাড়ি থামালেন মেরিচাচী। 'নামবি? অনেক খেটেছিস। খিদে লাগেনি?'

'এখনও লাগেনি।'

'ঠিক আছে, লাগলে চলে আসিস। খাবার রেডি করে রাখব আমি।'

ভ্যান থেকে নেমে পড়ল লধশরা, টিটু সহ। নেমেই ছোটাছুটি শুরু করল মাঠের মধ্যে। বসন্তের চমৎকার দিন। বুনো ফুলে ছেয়ে আছে আশপাশের ঝোপঝাড়গুলো। পাখির ডাকে মুখরিত। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বাতাসে বার বার মাথা নুইয়ে যেন অভিবাদন জানাচ্ছে কাউস্লিপের ঝাড়, গর্তের ভিতর থেকে মাথা তুলে বাইরের পৃথিবীটাকে দেখবার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে উজ্জ্বল রঙের সেলানডাইন।

'কি চকচকে দেখেছ,' অনিতা বলল। 'মনে হয় পালিশ করা।'

চেঁচিয়ে উঠল একটা কণ্ঠ, থমকে গেল লধশরা। 'এই, দাঁড়াও দাঁড়াও, আমরা আসছি!'

'খাইছে! বাবলি আর নিনা!' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল মুসা।

পাহাড়ের ওদিক থেকে লাফাতে লাফাতে দৌড়ে এগোল ওরা দুজন। কাছে এসে বাবলি বলল, 'এই, ক্যারাভানটার কী খবর?'

জানানো হলো। আগ্রহ নিয়ে শুনল বাবলি আর নিনা। 'আমাদেরও দলে নিতে পারতে,' বাবলি বলল। 'কেসের কাজ তো আর নয়। মানুষকে সাহায্য করার ব্যাপার।'

'দল-বেদজ্ঞের কী হলো?' মিশা বলল। 'বাজার থেকে কিছু কিনে দিয়ে এলেই পারো।'

'তা-ই করব। তো এখন কি তোমাদের সঙ্গে থাকা যাবে? নাকি গোপন আলোচনা আছে?'

'গাধা নাকি,' কিশোর বলল। 'গোপন আলোচনা মাঠে বসে করে কেউ? মিটিং ডাকলে তো ছাউনিতে বসতাম। ইচ্ছে করলে থাকতে পারো এখন আমাদের সঙ্গে।'

'নিনা একটা চমৎকার কবিতা লিখেছে,' হেসে বলল বাবলি। 'লধশদের নিয়ে। শুনবে?'

'না।' সাফ জবাব দিয়ে দিল বব।

'শোনোই না। ভাল কবিতা। তাই না রে, নিনা?'

'এঁহ, নিনা লিখবে কবিতা,' টিটকারি দিয়ে বলল মুসা। 'তা-ও আবার চমৎকার! শুনলে আমাদের টিটুটাও খেঁক-খেঁক করে হাসবে। তাই না রে, টিটু?'

'তাই না রে, টিটু!' মুখ ভেঙচে বলল বাবলি। 'তোকে কে শুনতে বলেছে? তুই কবিতার কী বুঝিস?'

'তুমি বোঝো কচুটা!' বুড়ো আঙুল দেখাল মুসা।

এককথায় দুকথায় ভাইবোনে লেগে গেল ঝগড়া। শেষে মারমুখো হয়ে উঠল মুসা। বেগতিক দেখে পাহাড়ের দিকে ছুট দিল বাবলি আর নিনা। কিছুদূর গিয়ে থেমে লধশদের দিকে ফিরে মুখ ভেঙচাল। গা জ্বালানো ছড়া বলতে লাগল জোরে জোরে। মুসা আবার তাড়া করতে যেতেই আবার দৌড় দিল দুজনে

'দিল্ মেজাজটা বিগড়ে,' বিরক্ত হয়ে বলল মুসা। 'ওই শয়তানটা এলেই ওরকম করে।...একটার জ্বালায় বাঁচি না, এখন দুটো একসাথে হয়েছে!'

'ছড়াটা কি লিখেছে দেখলে!' অনিতা বলল। 'দাঁড়াও, আমরাও একটা লিখব। পিত্তি জ্বালিয়ে দেব ওদের।'

'এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে চলো হাঁটি,' পরামর্শ দিল কিশোর। 'ওদের কথা ভুলে যাও। অযথা মন খারাপ করে বিকেলটা নষ্ট করে লাভ নেই।'

ক্ষেতের ধার দিয়ে হেঁটে চলল ওরা। একটা কাকতাড়ুয়া পুতুল দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই। ওটার কালো হ্যাটের উপর বসে আছে একটা দাঁড়কাক।

'কাক তাড়ানোর জন্যে পুতুল বানিয়েছে,' হেসে বলল বব। 'অথচ ওটার ওপরই এসে বসেছে কাক। ভয় আর পেল কই?'

'আজকাল কাকেরাও সব ফাঁকি বুঝে ফেলেছে,' রবিন বলল।

গলা বাড়িয়ে পুতুলটার মুখে ঠোকরাতে শুরু করল কাকটা।

খারাপ লাগল ডলির। তার মনে হলো সত্যি সত্যি একটা মানুষকে ঠোকরাচ্ছে কাকটা। মনে পড়ে গেল আলফ্রেড হিচককের তৈরি 'দ্য বার্ড' ছবিটার কথা। শিউরে উঠল সে। কাকটার দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে চেঁচিয়ে বলল, 'যা যা, ভাগ! এই কাউয়া, ভাগ বলছি!'

বার দুই কা কা করে উঠল পাখিটা। যেন ওদেরকে ব্যঙ্গ করে হাসল। তারপর কালো ডানা ছড়িয়ে দিয়ে উড়ে গেল। যাওয়ার সময় শূন্যে থেকেই ডাকল আরও কয়েকবার।

'শয়তানটা নিশ্চয় আমাদের টিটকারি মেরে গেল,' অনিতা বলল। 'বাবলির মত। আজ কার মুখ দেখে যে ঘুম ভেঙেছিল...'

'যার মুখ দেখেই ভাঙুক,' মুসা বলল, 'আমার খিদে পেয়েছে। চলো, কিশোরদের বাড়িতে চলে যাই। আন্টি নিশ্চয় এতক্ষণে খাবার তৈরি করে বসে আছেন।'

মুসার কথায় সবারই মনে পড়ল খাবারের কথা। খিদে টের পেল। তাড়াতাড়ি পা চালাল ওরা কিশোরদের বাড়ির দিকে।

আট

বাড়ি ফিরে দেখল, সত্যিই খাবার তৈরি করে ওদের অপেক্ষায় বসে আছেন মেরিচাচী। হাত-মুখ ধুয়ে এসে টেবিলে বসল ওরা। অনেক রকম খাবার।

'বাহ্, দারুণ!' আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল মুসা।

'মোরব্বা আমার ভীষণ ভাল লাগে!' বলল বব। 'কেকেও অনেক মাখন লাগিয়েছেন, আন্টি। পুরোটাই খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে।'

'খাও না কে মানা করেছে?' হেসে বললেন মেরিচাচী। 'অনেক খেটেছ তোমরা আজ। খিদে তো পাবেই। এই, কিশোর, আসার সময় বাবলি আর নিনাকে দেখলাম মাঠের দিকে যাচ্ছে। নিশ্চয় দেখা হয়েছে তোদের সঙ্গে নিয়ে এলি না কেন?'

'ওই শয়তানগুলোকে!' সিদ্ধ ডিমে কামড় দিতে গিয়ে থেমে গেল কিশোর। 'এখানে এসেও জ্বালাতন করবে। এত দজ্জাল মেয়ে আমি আর দেখিনি!'

'শেষে একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড বাধিয়ে ছাড়ত,' গম্ভীর হয়ে বলল মুসা। 'আসেনি, ভাল হয়েছে, আন্টি…'

'ছিহ্, বোনের সম্পর্কে ওভাবে কথা বলে না,' মেরিচাচী বললেন। 'এই বয়েসে একআধটু দুষ্টুমি সবাই করে। বাবলি নাহয় একটু বেশিই করে। তাতে কি। বড় হলে দেখবে এই দুষ্টুমির কথা মনে করেই কত হাসাহাসি করবে তোমরা। তখন এই দুষ্টুমিটুকু পাওয়ার জন্যেই আঁইটাঁই করবে মন।'

'সাধে কী আর বলি? আমাদেরকে নিয়ে বিচ্ছিরি একটা কবিতা লিখেছে ওরা,' বব বলল।

'লিখুক। পারলে তোমরাও লেখো। শোধ নেয়া হয়ে যাবে।'

'তা-ই করব!' টেবিল চাপড়ে বলল বব।

'ঠিক আছে, কথা না বলে খাবারগুলো শেষ করে ফেলো এখন।'

খাওয়া শেষ হলো।

এঁটো কাপ-প্লেটগুলো ধুতে নিয়ে গেল ওরা। ধুয়ে মুছে সুন্দর করে তাকে সাজিয়ে রাখল।

এবার বিদায়ের পালা।

কিশোর বলল, 'কাল মিটিঙে বসতে চাই। সকাল দশটায় আসতে পারবে সবাই?'

'আমি এগারোটার আগে পারব না,' ডলি বলল।

সেই কথাই রইল। এগারোটায়ই মিটিং বসবে ঠিক হলো।

'নতুন আরেকটা সঙ্কেত দরকার আমাদের,' কিশোর বলল। 'আগেরটা শুনে ফেলেছে বাবলি। কী রাখা যায় বলো তো?'

অনেকক্ষণ ধরে তার উপর কারও নজর নেই দেখে মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে বেচারা টিটুর। দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য মেঝেতে জোরে জোরে লেজের বাড়ি মারল সে। বিচিত্র থাপথাপ শব্দ হলো।

ঝট করে সেদিকে তাকিয়ে কী ভাবল কিশোর। উজ্জ্বল হলো মুখ। হেসে বলল, 'থাপথাপ! আমাদের নতুন সঙ্কেত হবে থাপথাপ। ধন্যবাদ, টিটু। কারও কোন আপত্তি আছে?'

নেই।

কাজেই পরদিন সকালে যখন দরজায় টোকা পড়ল, কিশোর সঙ্কেত জিজ্ঞেস করলে জবাব দিল মিশা, 'থাপথাপ।'

খুলে দেওয়া হলো দরজা।

সদস্যরা সবাই এসে হাজির হলো। গোল হয়ে আলোচনায় বসল ওরা। সবার মনেই একটা প্রশ্ন, ক্যারাভানে মারফিরা কেমন রাত কাটাল। ডলি আর অনিতা জানতে চাইল, সকালে টম এসে দুধ নিয়ে গেছে কিনা মেরিচাচীর কাছ থেকে। বব জানতে চাইল মুসার কাছে, ওরা যে মিটিঙে বসেছে এ-কথা বাবলি আর নিনা জানে কিনা।

'না,' মুসা বলল। 'ফাঁকি দিয়ে টুক করে বেরিয়ে পড়েছি ঘর থেকে। সারাটা সকাল জ্বালিয়ে মেরেছে আমাকে। ওদের সেই বিচ্ছিরি ছড়াটা শুনিয়ে শুনিয়ে কান পচিয়ে ফেলেছে আমার। শয়তানগুলোকে আচ্ছামত ধোলাই দিতে হবে। এই, কেউ কোন ছড়া লিখতে পেরেছ?'

কেউ জবাব দেওয়ার আগেই বাইরে ঘাউ করে উঠল টিটু। পরক্ষণেই টোকা পড়ল দরজায়।

'কে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'সঙ্কেত বলতে না পারলে ঢুকতে দেয়া হবে না।'

'আমি,' জবাব এল। 'আমি টম।'

কী ব্যাপার? ভাবতে ভাবতে গিয়ে দরজা খুলে দিল কিশোর।

মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে আছে টম। 'কাল ক্ষেতের মধ্যে একটা কাকতাড়ুয়া পুতুলের কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলে দেখলাম। তাই জিজ্ঞেস করতে এসেছি। ওটার গায়ের কাপড়গুলো কে জানি খুলে নিয়ে গেছে। রাজ্যের কাক এসে জড়ো হয়েছে আজ ক্ষেতে। ফসলের সর্বনাশ করে দিচ্ছে। পুতুলের গায়ে কাপড় না থাকলে ভয় পায় না ওরা।'

'থাকলেও পায় না। কাল দেখেছি,' কিশোর বলল।

'সেটা একআধটার বেলায়। তা কিছু জানো নাকি?'

'না, আমরা কী করে জানব কে কাপড় খুলে নিয়েছে? হবে হয়তো কোন শয়তান ছেলেটেলে।'

'হুঁ!' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল টম। 'তোমরা নাকি আজকাল ভাল গোয়েন্দা হয়ে উঠেছ। একটু খোঁজটোজ করে দেখো না কে নিল? খবর পেলে জানিয়ো।...আশ্চর্য! ওরকম একটা কাজ কে করতে গেল? পুতুলের গায়ের ছেঁড়া পোশাকের দরকার পড়ল কার?'

আনমনে বিড়বিড় করতে করতে চলে গেল টম।

নয়

একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল লধশরা। অবাক হয়েছে।

'কালও তো দেখেছি পরনে কাপড় আছে,' কিশোর বলল। 'মাথায় একটা কাক বসে ছিল। কাকে নিশ্চয় কাপড় খুলে নিয়ে যায়নি।'

'কে নিল ওগুলো?' কিশোরের প্রশ্ন। 'পুরানো, ছেঁড়া। একেবারে বাতিল জিনিস, তাই না?'

'তার ওপর অনেক দিন ছিল পুতুলটার গায়ে,' মিশা বলল। 'রোদে-বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে গেছে। নিয়ে যে কেউ পরতে পারবে সে উপায়ও নেই।'

'এক কানাকড়ি দাম নেই ওগুলোর,' বলল কিশোর। 'টম যে এসে আমাদের জিজ্ঞেস করেছে, এটাই অবাক লাগছে আমার।'

'এই,' বব বলল হঠাৎ, 'বাবলি আর নিনা নয় তো?'

সবাই ভেবে দেখল কথাটা। হতেও পারে।

'এ-সব শয়তানী ওদের পক্ষেই সম্ভব,' বলল মুসা। 'ওরা হয়তো ভেবেছে খুব মজার কাজ করছে। হয়তো মনে করেছে, সব দোষ পড়বে আমাদের ঘাড়ে। কারণ ওটার কাছে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা। চোর ভাববে আমাদেরকে।'

'বাড়ি গিয়ে বাবলিকে জিজ্ঞেস করো,' মুসাকে বলে দিল কিশোর। 'শুনে যদি হাসে, কিছু বলবে না, আমাকে এসে জানাবে। তারপর দেখব কী করা যায়। কাপড়গুলো বের করে দেয়ার অনুরোধ আমাদেরকেই করে গেছে টম।'

'হ্যাঁ, আমাদের ওপর নিশ্চয় ভরসা আছে তার,' গর্বের সুরে বলল মুসা।

'আচ্ছা, আপাতত এ-সব কথা থাক,' প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল কিশোর। 'আজ রাতে সিনেমায় যেতে চাও কেউ? আমি আর মিশা যাচ্ছি। ইচ্ছে হলে আসতে পারো।'

'আমি পারব না,' মুসা বলল। 'মাকে বললেই বলবে বাবলি আর নিনাকে নিয়ে যা। ওই দুটো ইবলিসকে পাশে নিয়ে সিনেমা দেখা সম্ভব না।'

'আমি আর অনিতাও যেতে পারব না,' ডলি বলল। 'এক বন্ধুর বাড়িতে চায়ের দাওয়াত আছে আমাদের।'

'আমি যাব,' রবিন বলল। ববও মাথা ঝাঁকাল। 'তা হলে চারজন হলাম আমরা। হলে ছবি শুরু হওয়ার পাঁচ মিনিট আগে দেখা করব। তো, কাকতাড়ুয়া পুতুলের কাপড়ের কথা কী ভাবছ? খোঁজ করব ওগুলোর?'

'আগে বাবলিকে জিজ্ঞেস করে আসুক মুসা, তারপর ভাবা যাবে,' উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'আজ মিটিং তা হলে এখানেই শেষ।'

সিনেমা হলে বব আর রবিনের সঙ্গে দেখা হলো কিশোর আর মিশার। টিকেট কাটল কিশোর। ছবিটা ভাল। একেবারে শেষ পর্যন্ত টানটান উত্তেজনা। ছবি শেষ হলে হল থেকে বেরোল ওরা। অন্ধকার রাত। একটা তারাও চোখে পড়ছে না।

সাইকেল এনেছে কিশোর আর মিশা। অন্য দুজন আনেনি, হেঁটেই যাবে। বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সাইকেলে চাপল কিশোর ও মিশা। অন্ধকারে সাইকেলের আগে আগে নাচছে হেডলাইটের আলোক-রশ্মি। কথা বলতে বলতে হেঁটে চলেছে রবিন আর বব। বেশির ভাগ দোকানই বন্ধ হয়ে গেছে, বাকিগুলোও বন্ধ হওয়ার পথে। বন্ধ হওয়া অনেক দোকানেরই শো-কেস দেখা যাচ্ছে লোহার গ্রিলের ফাঁক দিয়ে। নানারকম জিনিসে বোঝাই। দেখতে দেখতে চলেছে দুজনে।

সাইকেলের দোকানটা এখনও খোলা। সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল বব। নতুন মডেলের রেসিং সাইকেলগুলোর দিকে তাকাল লোভাতুর চোখে। ভাবখানা, আহা, যদি একটা কিনতে পারতাম পাশের দোকানটা একটা অ্যানটিক শপ। লোকের সংগ্রহে রাখবার মত নানারকম বিচিত্র জিনিস বিক্রি হয় ওখানে–পুরানো ছবি, অলংকার, টী-সেট, বাদ্যযন্ত্র, চেয়ার আর অন্যান্য আসবাবপত্র।

ওটার সামনে এসে একটা ছবি দেখল কিছুক্ষণ ওরা। মধ্যযুগীয় একটা যুদ্ধের দৃশ্য আঁকা রয়েছে ছবিটাতে। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করল। কোণের কাছে এসে হঠাৎ বলে উঠল রবিন, 'আরে, আমার ঘড়ি কই! কোথায় পড়ল? হলেই ফেলে দিয়ে এলাম নাকি…চলো তো দেখি।'

ফিরে চলল আবার দুজনে। যে পথে এসেছে সেপথে টর্চের আলো ফেলে দেখতে দেখতে চলেছে, রাস্তায় কোথাও পড়ল কিনা ঘড়িটা। ম্লান হয়ে এল আলো, তারপর নিভে গেল।

'ধূর!' গুঙিয়ে উঠল রবিন। 'ব্যাটারি শেষ হওয়ার আর সময় পেল না! আমার টর্চটাও নিয়ে আসা উচিত ছিল। এখন এই অন্ধকারে কোথায় ঘড়ি খুঁজব, কীভাবে খুঁজব!'

হালকা পায়ে ওদের পাশ কাটিয়ে গেল একজন লোক। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলে দুটোকে বোধহয় দেখল না। এতই নিঃশব্দে এল লোকটা, চমকে দিল

দুজনকে।

'পুলিশ নাকি?' ফিসফিসিয়ে বলল বব। 'চলো না দেখি। পুলিশ হলে তোমার ঘড়ি হারানোর কথা জানিয়ে রাখব। কেউ পেয়ে যদি থানায় দিয়ে আসে, তা হলে আবার ফেরত পাবে।'

'ঠিক বলেছ। চলো।'

লোকটার পিছু নিল দুজনে। দ্রুত হাঁটছে লোকটা। অনেক এগিয়ে গেছে। ওরাও চলবার গতি বাড়িয়ে দিল।

অ্যানটিক শপের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা। সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাল চারপাশে। তার আচার-আচরণ কেমন যেন অদ্ভুত।

'নাহ্, পুলিশ তো না!' রবিন বলল। 'ওরকম করছে কেন?'

কেন করছে সেটা খুব তাড়াতাড়িই জানা গেল। দ্রুত ঘটে গেল ঘটনা। কোটের ভিতর থেকে কী যেন বের করে দোকানের আলোকিত জানালায় ছুঁড়ে মারল সে। ঝনঝন করে কাঁচ ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল। অবাক হয়ে ছেলেরা দেখল, হাত বাড়িয়ে কী একটা জিনিস ছোঁ মেরে তুলে নিয়েই দৌড় দিল লোকটা।

ওদের পাশ দিয়েই ছুটে গেল। ঠেকানোর জন্য ঝট করে একটা পা বাড়িয়ে দিল রবিন, যাতে তার পায়ে বেধে হুমড়ি খেয়ে পড়ে লোকটা। কিন্তু পড়ল না। শেষ মুহূর্তে সরে গিয়ে আবার ছুটল। একটা ল্যাম্প পোস্টের তলা দিয়ে দ্রুত হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

'ধর ব্যাটাকে!' বলেই দৌড় দিল বব। লোকটা যেখানে অদৃশ্য হয়েছে সেই কোণটার কাছে চলে এল। কিন্তু অন্ধকারের জন্য দেখা গেল না তাকে। কোন শব্দও শোনা গেল না।

কাঁচ ভাঙবার শব্দ লোকের কানে গেছে। আশপাশের বাড়িঘর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে আসছে ওরা। 'কী হয়েছে, কী হয়েছে' বলে চেঁচামেচি করছে। কোথা থেকে এসে উদয় হলো একজন পুলিশম্যান। বেশ হৈ-হট্টগোল শুরু হয়েছে।

লধশদের জন্য বোধহয় একটা কেস পাওয়া গেল, ভাবল রবিন আর বব।

দশ

অ্যানটিক শপের কাছে দৌড়ে ফিরে এল ওরা। দোকানটার মালিক ছোটখাট একজন বুড়ো মানুষ। হাত মোচড়াচ্ছে জানালার অবস্থা দেখে।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল বিশালদেহী পুলিশম্যান। হাতে নোটবুক। 'কে করেছে এই অবস্থা?'

'একটা লোক,' জবাব দিল একজন। 'এক পলক দেখেছি রাস্তা দিয়ে দৌড়ে

যাচ্ছিল যখন। দেখতে কেমন কিছুই বলতে পারব না। অন্ধকার। তা ছাড়া জোরে দৌড়াচ্ছিল।'

'কি নিয়েছে?' দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল পুলিশম্যান।

'এখনও বলতে পারছি না, দেখতে হবে,' জবাব দিল দোকানদার। 'হায় হায়, আমার যুদ্ধের ছবিটা তো কেটেকুটে শেষ! আরে, দামি ফুলের ভাসটাও গেছে! নিশ্চয় ইঁট মেরেছিল শয়তানটা! ওখানটায় আর কী ছিল মনে করতে পারছি না। আমার অ্যাসিসটেন্টকে জিজ্ঞেস করতে হবে। কাল নতুন করে মাল সাজিয়েছিল জানালার সামনে। আমি কাল ছিলাম না। ইস্, একেবারে সর্বনাশ হয়ে গেছে!'

দোকানের সামনে ততক্ষণে ভিড় জমে গেছে। আরেকজন পুলিশম্যান এসে হাজির হলো। ঘটনাটা ওরা দেখেছে সেকথা বলবে কিনা মনস্থির করতে পারছে না রবিন আর বব। মুখ খুলতে যাবে বব, এই সময় একজন পুলিশের চোখে পড়ল ভিড়ের মধ্যে কয়েকটা ছেলেও রয়েছে। ধমক দিয়ে বলল সে, 'এই, তোমাদের এখানে কী? যাও, বাড়ি যাও। এখানে খেলা হচ্ছে না।'

সরে এল বব আর রবিন।

'কিশোরকে জানাতে হবে,' বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল বব। 'মিটিঙে বসা দরকার।'

একমত হলো রবিন।

পরদিন সকালে কিশোরকে ফোন করল সে। 'কিশোর, শোনো, কাল রাতে একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে। হেঁটে বাড়ি ফিরছিলাম। পথে একটা অ্যানটিক শপ আছে না, একটা লোক ওটার জানালা ভেঙে কী যেন চুরি করে নিয়ে গেল, আমাদের চোখের সামনে। তাড়া করেছিলাম, কিন্তু ধরতে পারিনি। লোকটার চেহারাও দেখতে পাইনি। কি বলো, একটা মিটিং ডাকা দরকার?'

'তোমরা নিজের চোখে দেখেছ? আমি শুনেছি সকালে। চাচা কোত্থেকে শুনে এসে নাস্তার টেবিলে বলল। উহ্, কাল আমি আর মিশাও দেখতে পারতাম, সাইকেল না নিয়ে গেলে!'

'আমরাও দেখতাম না, যদি আমার ঘড়িটা না হারাত। হঠাৎ খেয়াল করলাম, হাতে ঘড়ি নেই। আবার ফিরে চললাম খুঁজতে, সিনেমা হলের দিকে। না গেলে আর দেখতে পেতাম না। তো মিটিং কটায় বসছে? আমি আর বব খবর দিয়ে দেব সবাইকে।'

'চলে এসো যত জলদি পারো। ছাউনিতে থাকব।'

ছাউনিতে এসে হাজির হলো সদস্যরা। উত্তেজিত। সবাই শুনেছে দোকানের কাঁচ ভেঙে জিনিস ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার খবর। তবে কী নিয়ে গেছে, সেটা জানে না কেউ, শুধু ডলি ছাড়া।

অন্যদের মতই চুপ করে বব আর রবিনের গল্প শুনল সে-ও।

'আসলে,' রবিন বলল, 'ঘড়িটা হারাইনি। তাড়াহুড়ো করে সিনেমা দেখতে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। ঘড়িটা নিয়েই যাইনি, বাড়ি ফিরে টেবিলের ওপরই পেয়েছি।'

'তাই নাকি?' বব বলল। 'ওদিকে কাল কী খোঁজাটাই না খুঁজলাম। টর্চের ব্যাটারি শেষ না হলে আরও খুঁজতাম। তবে খোঁজাটা বিফলে যায়নি। ফিরে না গেলে লোকটাকে চুরি করতে দেখতাম না। লোকটা কি ধরা পড়েছে, জানো কেউ?'

'না। তোমরা কেউ কিছু জানো?' সবার দিকে তাকাল কিশোর।

'লোকটা ধরা পড়েছে কিনা জানি না,' ডলি বলল, 'তবে কী নিয়েছে জানি। পুরানো একটা বেহালা। অনেক দামি। অ্যানটিক মূল্য অনেক ওটার, কয়েকশো ডলারের কম না। জানালায় সাজানো ছিল, ঐতিহাসিক জিনিস।'

'চোরটা নিশ্চয় বেহালাবাদক,' মন্তব্য করল কিশোর। অন্যেরাও একই কথা ভাবছে। 'শহরের সব বেহালাবাদকের কাছেই খোঁজ নেবে পুলিশ।'

'আমাদের স্কুলের মিস বেরিলিনকে না ঘাঁটালেই হয়,' ডলি বলল। মিস বেরিলিন ওদের স্কুলের মিউজিক টীচার। 'তাঁকে সন্দেহ করা হচ্ছে, এ-কথা কোনভাবে একবার মনে ঢুকলেই হয়, হার্টফেল করে মরবেন মহিলা। যা ভীতু। মনে নেই, একবার পিয়ানোর একটা চাবি ভেঙে ফেলে কী রকম হয়ে গিয়েছিলেন? পুরো দেড়টি ঘণ্টা কথা বলতে পারেননি, মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলেন...'

'চাবিটা আসলে ম্যাডাম ভাঙেননি,' মুসা বলল। 'কে ভেঙেছিল, জানি। কিন্তু বলিনি।'

'আমিও জানি,' ডলি বলল। 'তোমার বোন বাবলি। ভেঙে ফেলে আবার লাগিয়ে রেখে দিয়েছিল। ম্যাডাম এসে টিপ দিতেই গেল ছুটে। তিনি তো মনে করলেন তিনিই ভেঙেছেন। ওই ম্যাডাম গিয়ে দোকানের জানালা ভেঙে বেহালা ছিনতাই করবেন, কল্পনাই করা যায় না।'

'তা ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'চাচা বলছিল, লোকটার চেহারা নাকি কেউ দেখতে পায়নি। তোমরা দেখেছ?' বব আর রবিনের দিকে তাকাল সে।

'ভালমত দেখিনি,' বব জানাল। 'পলকের জন্যে দেখেছি।'

'বলে ফেলো,' পকেট থেকে নোটবুক বের করল কিশোর। 'কাজে লাগতে পারে। বলা যায় না, খুঁজে খুঁজে লোকটাকে বেরও করে ফেলতে পারি।'

'মাঝারি উচ্চতা,' বব বলল। 'বাদামি টুইডের এত পুরানো কোট, ছেঁড়া, যে ফকিরেও পরবে না। হালকা ধূসর রঙের প্যান্ট, ময়লা। মাথায় কালো হ্যাট, কয়েকটা ফুটো। গলায় জড়ানো একটা রুমাল, তাতে লাল-সাদা ফুটকি।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল কিশোরের চোখের তারা। আচমকা চিৎকার করে উঠল সে, 'বব, বুঝতে পারছ কী বলছ! পুরানো, ছেঁড়া পোশাক! কাকতাড়ুয়া পুতুলের গায়ে যে পোশাকগুলো ছিল, তার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়!'

এগারো

হাঁ করে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সবাই। বলে কী! বেহালাচোর পুতুলের কাপড় চুরি করেছে? কিন্তু কেন?

হেসে ঠাট্টার সুরে ডলি বলল, 'নাকি কাকতাড়ুয়া পুতুলটাই ক্ষেত থেকে বেরিয়ে গিয়ে বেহালা চুরি করল?'

'হাসির কথা বলছি না,' গম্ভীর হয়ে রইল কিশোর। 'ভাল করেই জানো, ওটার গায়ে এখন কাপড় নেই।...ব্যাপারটা ভারি অদ্ভুত!' ধীরে ধীরে বলল সে। 'বাবলি আর নিনাকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেয়া যায়।'

'ও হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম,' মুসা বলল। 'ওদের জিজ্ঞেস করেছিলাম। পুতুলের কাপড় চুরি যাওয়ার কথা শুনে হেসেই খুন। ওরা এ-কাজ করেছে এটা শুরু থেকেই বিশ্বাস হয়নি আমার।'

'না, ওরা করেনি। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবো এখন সবাই। কারও কোন পরামর্শ থাকলে বলতে পারো। দুটো সূত্র আছে আমাদের হাতে: এক, গতরাতে একটা দামি বেহালা চুরি করেছে একজন লোক। দুই, তার পরনে ছিল কাকতাড়ুয়ার চুরি যাওয়া পোশাক। এই দুটো সূত্র থেকে কী বুঝব আমরা?'

'বেহালাটা পুরানো, দামি,' রবিন বলল। 'কাজেই জিনিসটা যে চুরি করেছে, তার একটা কারণ ওটার মূল্য। দ্বিতীয় কারণ, সে নিজে বেহালাবাদক, কিংবা অ্যানটিকে আগ্রহী।'

'আর চুরি করার সময় পুরানো পোশাক পরেছে ছদ্মবেশ নেয়ার জন্যে,' অনিতা বলল। 'যাতে তাকে কেউ চিনতে না পারে।'

'পুরানো কাপড়ের দোকান থেকেও কিনতে পারত,' মুসা বলল। 'কিন্তু তা হলেও ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় ছিল। পুলিশ জিজ্ঞেস করলে দোকানদারের কাছ থেকে তার চেহারার বর্ণনা পেয়ে যেত।'

'সুতরাং আমাদের কাকতাড়ুয়ার ওপরই চোখ পড়েছে তার,' উপসংহার টানল কিশোর। 'চুরি করার পর এখন নিশ্চয় কাপড়গুলো লুকিয়ে ফেলেছে। কিংবা ফেলে দিয়েছে।'

'কে জানে, আবার পুতুলটাকেই পরিয়ে দিয়ে গেছে কিনা,' বব বলল।

'না। তা করবে না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'কারও নজরে পড়ে যাওয়ার ভয়

আছে। তারচেয়ে নষ্ট করে ফেলাটা অনেক নিরাপদ। হয়তো পুড়িয়েই ফেলেছে। মাটি চাপাও দিয়ে দিতে পারে।'

'ওগুলো খোঁজা দরকার,' মিশা বলল।

'চেষ্টা করা যেতে পারে। আর কারও কোন পরামর্শ?'

আর কেউ কিছু বলতে পারল না। কাকতাড়ুয়ার পোশাক পরা একজন বেহালাবাদককে খুঁজে বের করা অসম্ভবই মনে হচ্ছে ওদের কাছে, বিশেষ করে হাতে যখন তেমন কোন জোরাল সূত্র নেই।

'এমন কোন বেহালাবাদককে কি চিনি আমরা,' ডলির প্রশ্ন, 'যে পুরানো বেহালা ভালবাসে?'

'চিনি তো কয়েকজনকেই,' কিশোর বলল। 'কিন্তু তাদের কেউই ওরকমভাবে একটা বেহালা চুরি করতে যাবে না। সানফ্লাওয়ার স্কুলের মিউজিক টীচার মিস্টার রবার্টসনকে চিনি, ভাল বেহালা বাজান। গির্জার পাদ্রী সাহেব আর তাঁর স্ত্রীও বাজাতে পারেন। আরও দুতিনজনকে চিনি। তাদের কাউকে কি চোর মনে হয়?'

মাথা নাড়ল সবাই।

মুসা বলল, 'তা-ও আবার পুতুলের পোশাক পরে চুরি করা?'

'না। জটিল একটা রহস্য, বুঝলে।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল কিশোর, 'আর পুরানো কাপড়ই বা কোথায় গিয়ে খুঁজব? হাজারটা গর্ত আর ঝোপ রয়েছে এখানে ওখানে। কোথায় ফেলেছে কিংবা মাটি চাপা দিয়ে দিয়েছে কে জানে। আর পুড়িয়ে ফেললে তো কোন চিহ্নই পাব না।'

হঠাৎ ঘেউ ঘেউ শুরু করল টিটু। মুখ তুলল সবাই।

'শিওর বাবলি,' তিক্ত কণ্ঠে বলল মুসা। 'আজ এক জায়গায় আমাদের বেড়াতে যাবার কথা। নিশ্চয় সেজন্যে ডাকতে এসেছে আমাকে।'

ঠিক ওই মুহূর্তে সুর করে ছড়া বলতে শুরু করল নিনা আর বাবলি, আগের দিন যেটা বলে লধশদের খেপিয়েছিল।

লাফ দিয়ে উঠে দরজার কাছে ছুটে গেল রবিন। একঝটকায় দরজা খুলে দিয়ে চেঁচিয়ে পাল্টা আরেকটা ছড়া বলতে আরম্ভ করল, বাবলি আর নিনাকে নিয়ে লিখেছে।

থেমে গেল বাবলি আর নিনার কণ্ঠ। গটগট করে রবিনের কাছে এসে দাঁড়াল বাবলি। 'এটা লিখেছো কেন! আমরা কি এত খারাপ খারাপ কথা বলেছি?'

'ভাল করেছি,' জবাব দিল রবিন। 'তোমরা আমাদের খেপাচ্ছ, জবাব তো একটা দিতেই হবে। দিলাম। তোমরা কি ভাল কথা লিখেছ নাকি? তা হলে রাগতাম?'

জবাব দিতে না পেরে রাগে ফুঁসতে লাগল বাবলি।

মজা পেয়ে রবিন বলল, 'তা ছাড়া দোষটা তোমাদেরই। তোমরাই শুরু

করেছ। এখন রাগ লাগে কেন? বেশি বাড়াবাড়ি করলে সবাই মিলে একসঙ্গে বলব। তখন দেখবে কেমন লাগে।'

'তোমার সঙ্গে কে কথা বলে!' আর কিছু বলতে না পেরে রবিনের দিক থেকে মুখ ফেরাল বাবলি। চেঁচিয়ে ভাইকে ডাকল, 'মুসা, জলদি চল, চাচী বসে আছেন। এখুনি যেতে বলেছেন।'

'আসছি, অত চেঁচাতে হবে না,' মুসা বলল। কিশোরকে জিজ্ঞেস করল নিচু গলায়, 'আজ বিকেলে কোথাও যাচ্ছি আমরা?'

'জ্যাকের বউকে দেখতে যেতে পারি। ক্যারাভানে কেমন কাটছে জানা দরকার। ছোট বাচ্চাটার জন্যে চাচী কিছু কাপড় দেবেন বলেছেন। আর টুকির জন্যে একটা খেলনা বাস।'

'ঠিক আছে। আড়াইটার মধ্যেই ফিরে আসছি। হবে?'

'তিনটেয় এখানে দেখা করলেই চলবে,' কিশোর বলল। 'কারও অসুবিধে হবে?'

মাথা নাড়ল সবাই।

'বেশ। জ্যাকের বউকে দেখতে যাব, চোখও খোলা রাখব। কাপড়গুলো খুঁজব...'

'শুনে ফেলেছি, সব কথা শুনে ফেলেছি,' হাততালি দিয়ে সুর করে বলল বাবলি। 'কাপড় খুঁজবে, না? তোমরা ভেবেছিলে আমি আর নিনা ওগুলো চুরি করেছি। গাধা আর কাকে বলে? ওই নোংরা কাপড় পরে কি নাচব নাকি আমরা? নিজেদেরকে খুব চালাক ভাবো তো, সে-জন্যেই এ-রকম ঠকো। আরও ঠকবে।'

'হয়েছে, আর মাতব্বরি করতে হবে না!' রেগে গিয়ে ধমক লাগাল মুসা। 'চুপ! একদম চুপ! নইলে খাবি মাথায় গাট্টা!'

মুসার মারমুখো মূর্তি দেখে তখনকার মত চুপ হয়ে গেল বাবলি, আর কিছু বলল না।

বারো

সেদিন বিকেল তিনটেয় দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ল লধশরা। সোজা রওনা হলো ক্যারাভানের দিকে। অবশ্যই ওদের সঙ্গে চলল টিটু।

'পুতুলটার পাশ দিয়েই যেতে হবে,' রবিন বলল। 'কিছু পরে আছে কিনা এখন ওটা আল্লাহই জানে।'

পোশাক পরাই আছে। বিচিত্র পোশাক। নানা জায়গা থেকে জোগাড় করা। পালক লাগানো মহিলাদের হ্যাট মাথায়। গায়ে একটা রেইনকোট, তাতে অসংখ্য

পরো। অনেক পুরানো একটা প্যান্ট, কত জায়গায় যে ছেঁড়া গুনে শেষ করা যাবে না। এ সব পোশাক পরে খুব যেন খারাপ লাগছে বেচারার, তাই মনমরা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

হ্যাটটা দেখে হাসতে আরম্ভ করল মিশা।

'ওটা কার হ্যাট জানি,' বলল সে। 'গির্জার পাদ্রীর গরু পোষে যে লোকটা, তার বউয়ের। সারাদিনই পরে থাকত। দুপুর বেলা গাছের নীচে বসে ঢুলত বাতাসে নাচত তখন ওই পালক, হাসি পেত আমার খুব।'

'প্যান্টটাও ওই রাখালটারই,' কিশোর বলল। 'আর রেইনকোটটা টমের। অদ্ভুত লাগছে এখন কাকতাড়ুয়াটাকে, তাই না? এই কাকতাড়ুয়া, তোর আগের পোশাকগুলো কইরে? কে নিল?'

বাতাসে পতপত করে উঠল পুতুলের রেইনকোটের হাতা। যেন প্রশ্নের জবাব দিল।

বিষণ্ণ পুতুলটাকে নিঃসঙ্গ করে দিয়ে আগে বাড়ল ওরা।

পথে একটা ছোট খাল পড়ল, উপরে পুল। পাহাড়ী ঝর্না থেকে এই খালের উৎপত্তি, টলটলে পরিষ্কার পানি, দেখেই যেন তৃষ্ণা পেল টিটুর। নাচতে নাচতে নেমে চলল খালটার দিকে।

কিন্তু পানির কাছে পৌঁছবার আগেই থমকে দাঁড়াল। নাক তুলে গন্ধ শুঁকতে লাগল বাতাসে। তারপর ঘুরল একটা খাদের দিকে। কোন কারণে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

'কী রে, টিটু?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'কী দেখেছিস?'

জবাবে কয়েকবার ঘেউ ঘেউ করে উঠে খাদের মধ্যে গিয়ে নামল টিটু। সামনের পা দিয়ে একজায়গায় মাটি আঁচড়াতে শুরু করল। কৌতূহলী হয়ে তার কাছে এসে দাঁড়াল লধশরা।

চেঁচিয়ে উঠল মিশা, 'কিশোর, দেখো দেখো! কী বের করেছে! কাপড় না? কিশোর, নিশ্চয়ই পুতুলটার কাপড়!'

'সে-রকমই লাগছে!' বলতে বলতে এগিয়ে গেল উত্তেজিত কিশোর। 'বের কর, টিটু। খোঁড়, আরও খোঁড়!'

বাহবা পেয়ে আরও দ্রুত পা চালাল টিটু। কাপড়টা আরেকটু বেরোতেই কামড়ে ধরে দিল টান। চেঁচাতে লাগল তারস্বরে।

কাপড়টা তার মুখ থেকে নিল কিশোর। স্কার্টের ছেঁড়া টুকরো বলেই মনে হলো। টিটু তখন আবার ব্যস্ত হয়ে পড়েছে আরও খোঁড়ার জন্য। মাঝে মাঝে মৃদু গোঁ গোঁ করে উঠছে উত্তেজনায়।

'আরও কিছু আছে,' মুসা বলল। 'পুরানো হ্যাটের মত লাগছে।'

ঠিকই আন্দাজ করেছে সে। আধ মিনিটের মধ্যেই হ্যাটটা টেনে বের করল

টিটু। কত পুরানো অনুমান করাই মুশকিল খড়ের তৈরি। চারপাশে গোল করে ফিতে লাগানো

চিনতে পারল ওটা ডলি। বলল, 'কিশোর, সানফ্লাওয়ার স্কুলের ছাত্রদের পরতে হয় ওরকম হ্যাট। কোন কাকতাড়ুয়ার মাথায়ই ওরকম জিনিস দেখিনি।'

টিটুর উৎসাহ তখনও বিন্দুমাত্র কমেনি। নিজের খোঁড়া গর্তের মধ্যে নাক ঢুকিয়ে দিয়ে গন্ধ শুঁকছে। তারপর আবার খুঁড়তে লাগল। আরও কিছুটা খোঁড়বার পর বেরোল একটা হাড়ের মাথা। কামড়ে ধরে টানাহেঁচড়া করে বের করে আনল বেশ বড় আর দুর্গন্ধ ছড়ানো একটা হাড়। গর্বের সঙ্গে সেটা এনে কিশোরের পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল সে। ভাবখানা, দেখেছ কী জিনিস বের করলাম! তার উৎসাহের আসল কারণ বোঝা গেল এতক্ষণে।

'এই জন্যেই তোর এত আনন্দ,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে বলল কিশোর। 'কিন্তু গর্তটা নতুন মনে হচ্ছে, আলগা মাটি। এই জিনিস এখানে এনে এ-ভাবে পুঁতে রাখতে গেল কে...'

খিলখিল হাসিতে ফেটে পড়ল মেয়েকণ্ঠ।

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল সবাই। তীরের কাশবনের ভিতর থেকে মাথা বের করেছে নিনা আর বাবলি।

'ওহ্, মরেই যাব, হি-হি-হি! ওহ্, আর সহ্য করতে পারছি না! টিটুরে, কী একখান কাণ্ডই না করলি! যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই করেছে! হি-হি-হি!' হেসেই চলেছে বাবলি।

নিনাও হাসছে দুলে দুলে। হাসতে হাসতেই কথা বলছে। 'হ্যাটটা পেয়ে ওদের মুখের কী অবস্থা হয়েছিল দেখেছিস, বাবলি! ওহ্হোরে, আজ বুঝি মরেই যাব হাসতে হাসতে! পেট ব্যথা হয়ে যাচ্ছে! আর পারি না!'

এত হাসাহাসি কিসের বুঝতে পারছে না টিটু। গোঁ গোঁ করে উঠল ওদের দিকে চেয়ে।

'চুপ, টিটু,' কিশোর বলল, 'কিচ্ছু হয়নি।' বাবলিদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাহলে এটা তোমাদের কাজ। হাড় আর কাপড় এনে পুঁতে রেখেছ। ঠিক আছে, দেখা যাবে...'

'কী দেখবে?' হাসিতে চোখে পানি এসে গেছে বাবলির। মুছতে মুছতে বলল, 'খুব চালাক ভাবো তো নিজেদের, সেজন্যেই ঠকো। মজাটা তো দেখলে এবার।'

'এই চলো,' বন্ধুদের দিকে চেয়ে বলল মুসা, 'হাসুক ওরা এখানে বসে বসে। মরুক। আমাদের কাজে আমরা যাই।'

গম্ভীর মুখে খালের পাড় থেকে উঠে এল সবাই। পুল পেরিয়ে চলল যেদিকে যাচ্ছিল। কিছুদূর আসার পর হঠাৎ হাসতে শুরু করল ডলি। বলল, 'সরি, কিছু মনে কোরো না কেউ। সত্যিই একটা মজার কাণ্ড হয়েছে।'

আবারও তার সাথে একমত হয়ে হাসতে লাগল 'কাপড় পেয়ে গেছি ভেবে না হয় বোকামিই না করলাম। তবে মজা হয়েছে, এ-কথা অস্বীকার করতে পারবে না।'

তবে ওদের কথা আর কেউ মানতে পারল না। যেভাবেই হোক, ওদেরকে নষ্ট ঠকান ঠকিয়েছে বাবলি। মুখ কালো করে কিশোর বলল, 'টিটু গাধাটা হাড়ের লোভে ওরকম পাগল হয়ে না গেলে কিছুই হতো না। এটা এত খায়, তা-ও হাড়ের লোভ ছাড়তে পারে না। হাড় দেখলে যে কেন কুত্তাগুলো ওরকম পাগল হয়ে ওঠে সেটা বিজ্ঞানীদের কাছে এখনও একটা বড় রহস্য।'

'হ্যা,' মাথা ঝাঁকাল মিশা।

'আর ওর এই লোভের কারণেই আজ এ-ভাবে অপদস্থ হলাম আমরা,' ফুঁসে উঠল মুসা। 'সুযোগ আমাদেরও আসবে। তখন দেখাব...'

'এই যে, এসে গেছি,' হাত তুলে ক্যারাভানটা দেখাল বব।

রবিন বলল, 'ভালই আছে মনে হচ্ছে। কাপড় কাচছে জ্যাকের বউ।'

তেরো

ছেলেমেয়েদের সাড়া পেয়ে মুখ তুলে তাকাল মহিলা। 'তোমরা এসেছ, খুব খুশি হলাম,' মিষ্টি হাসি হাসল সে। 'আরও পোঁটলা-পাটলি দেখছি?'

'খালা দিল,' মিশা বলল।

খুলে দেখল জ্যাকের বউ। 'বাহ্, খুব সুন্দর তো কোটটা।'

'আর এটা টুকির জন্যে,' বাসটা দিল কিশোর। 'খেলতে পারবে। ও কোথায়?'

'আছে আশে-পাশে কোথাও,' বলে গলা চড়িয়ে ডাকল মহিলা, 'টুকি! টুকি! কোথায় তুই? দেখে যা কী নিয়ে এসেছে।'

কিন্তু টুকির সাড়া মিলল না। তার মা বলল, 'লুকিয়ে পড়েছে। মানুষ দেখলেই ভয় পেয়ে যায়।'

'ও স্কুলে যায় না?' ডলি জিজ্ঞেস করল। চারপাশে তাকাচ্ছে। 'নাকি বেশি ছোট?'

'আট বছর। ছোট কই? না, স্কুলে যায় না যেতে নাকি ওর ভাল লাগে না ওর কপালটাই খারাপ। আর আমার এই বাচ্চাটাকেই দেখো না। প্র্যাম থেকে নেমে এসে যখন হাঁটতে শিখবে, বড় হবে, তখন ওকে নিয়েই বা কী করব আমি? ভবিষ্যৎ কী?'

ক্যারাভানের ভিতরটা দেখতে গেল মেয়েরা। অগোছাল হয়ে আছে

পরিষ্কারও নয় তেমন

'যা যা দরকার আপনার সব দিতে পেরেছি?' বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল মিশা। 'আর কিছু লাগবে?'

'না, সবই দিয়েছ তবে সুঁই-সুতো পেলে ভাল হতো। পুরানো কাপড় কেটে পর্দা বানিয়ে জানালায় লাগাতে পারতাম।'

'ঠিক আছে, দিয়ে যাব। কিন্তু কাপড় কাটবেন কী দিয়ে? কাঁচি নেই নিশ্চয়ই?'

'না, নেই। জ্যাক তার ছোট ছুরিটা দিয়ে গেছে এটা-ওটা কাটার জন্যে। টমও যতটা পারছে সাহায্য করছে।'

'দেখি, যত তাড়াতাড়ি পারি নিয়ে আসব,' মিশা বলল। 'আমার একটা ছোট ঝাড়ু আছে। কাজে লাগে না। ওটাও নিতে পারেন। আর কিছু?'

'একটা বালতি পেলে ভাল হতো। তোমরা যেটা দিয়ে গিয়েছিলে, সেটা টুকি নিয়ে গেছে। তবলা বাজায় ওটাতে। বাজনার খুব শখ। বাজানোর মত কিছু একটা পেলে তাই নিয়ে মজে থাকে।'

'নিয়ে আসব বালতি,' কিশোর বলল। 'ও কিসের শব্দ?'

'বালতি বাজাচ্ছে,' টুকির মা বলল। 'কাঠি দিয়ে বাড়ি মারছে। ও বালতিটাকে ড্রাম বানিয়ে নিয়েছে এখন। টুকি, টুকি, বালতিটা দিয়ে যা তো। কাজ আছে।'

বন্ধ হয়ে গেল শব্দ। তবে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও টুকির দেখা মিলল না। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে তার মা বলল, 'না, আসবে না। খুঁজতে গিয়েও লাভ নেই। এমনভাবে লুকিয়ে পড়বে, হাজার খুঁজেও বের করা যাবে না।'

'আপনার সাহেব কোথায়?' জানতে চাইল কিশোর। 'মেলায় চলে গেছে?'

'মেলা ওখান থেকে সরে গেছে আরেক জায়গায়, শোনোনি? হ্যাঁ, জ্যাকও গেছে সঙ্গে। এই তো, আজ সকালেই গেল। ক'দিন আর আসবে না। টম কাছাকাছি না থাকলে বড় একা লাগে আমার।'

মহিলার কথাবার্তায় তাকে প্রথম দিনই পছন্দ করেছিল মিশা, আজ আরও ভাল লাগল।

'ওই, ওই যে টুকি!' চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ মুসা। একটা ঝোপের ভিতর থেকে মুখ বের করেছে ছেলেটা, বড় বড় কালো চোখে পলক প্রায় পড়ছেই না।

'নিশ্চয় বালতিটা কোথাও লুকিয়ে রেখে এসেছে,' তার মা বলল। 'টুকি, দেখে যা, ওরা সুন্দর একটা খেলনা নিয়ে এসেছে তোর জন্যে। দেখে যা।'

যেখানে ছিল সেখানেই রইল টুকি। স্বভাব অদ্ভুত ছেলেটার, তবে চেহারাটা খুব মিষ্টি।

আস্তে করে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল টুকি। দ্বিধা করল এক মুহূর্ত। তারপর

[illegible] এগিয়ে আসতে লাগল। খানিক দূরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল আবার। হাঁটার [illegible] অদ্ভুত, অনেকটা অন্ধদের মত।

খেলনা বাসটা হাতে নিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেল কিশোর। নড়ল না টুকি। কাছে গিয়ে বাসটা তার দিকে বাড়িয়ে ধরল কিশোর। নেওয়ার জন্য হাত বাড়াল না ছেলেটা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। শেষে তার হাতে বাসটা গুঁজে দিল কিশোর।

শক্ত করে খেলনাটা চেপে ধরল টুকি। হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখতে লাগল গভীর আগ্রহে।

বাঁশি বাজানোর সুইচটায় আঙুল লাগতেই টিপে দিল। পিঁ-পিঁ শব্দ উঠল বাসের ভিতর থেকে। হাসি ফুটল টুকির মুখে। আবার টিপ দিয়ে বাঁশি শুনল। তারপর সুর করে অনুকরণ করল বাঁশির শব্দের। মায়ের দিকে ফিরে হেসে বলল, 'মা, এটা আমার জন্যে? ও মা, বাসটা কি আমার?'

'হ্যাঁ, তোমার। কিশোরকে ধন্যবাদ দাও,' ওর মা বলল।

'ধন্যবাদ,' ববের দিকে ফিরে বলল টুকি, কিশোরের দিকে নয়। মিশার মনে হলো ওরকম চোখ আর কখনও দেখেনি সে। বড়, কালো, গভীর। সুন্দর, তবে তাতে কোন অভিব্যক্তি নেই। দৃষ্টি কেমন যেন শূন্য।

ছুটে এসে টুকির পায়ে গা ঘষল টিটু। ভয় পেয়ে লাফিয়ে সরে গেল ছেলেটা। টিটুকে সরতে বলল কিশোর। এক মুহূর্ত আর দেরি করল না টুকি। ঘুরে ছুটতে ছুটতে গিয়ে ঢুকে পড়ল আবার ঝোপের ভিতরে। আঁউ আঁউ করে বিচিত্র শব্দ করে উঠল প্র্যামে শোয়ানো শিশুটা। যেন তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে সকলের। এগিয়ে গিয়ে তার ওপর ঝুঁকল মিশা। মোটা তুলতুলে হাত বাড়িয়ে মিশার গালে আলতো থাবা মারল শিশুটা। হেসে উঠল মিশা।

'তোমাকে পছন্দ করেছে,' হেসে মিশাকে বলল মা।

'এবার যেতে হয়,' ঘড়ি দেখে বলল কিশোর। 'মিসেস মারফি, আপনার জন্যে সুচ-সুতো আর বালতি নিয়ে আসব। আরও কিছু যদি পাই, আনব। ক্যারাভানটায় আপনি মানিয়ে নিতে পেরেছেন দেখে ভাল লাগছে।'

'এটা পাওয়ায় বেঁচে গেছি,' কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলল মহিলা। কাপড় ধোয়া শেষ হয়েছে। দুটো গাছের ডালে বাঁধা দড়িতে সেগুলো ঝোলাতে শুরু করল। 'কী বলে যে ধন্যবাদ দেব তোমাদের!'

ফিরে চলল লধশরা। আগে আগে লাফাতে লাফাতে চলেছে টিটু। পুলের কাছে এসে সেই গর্তটার দিকে চোখ পড়তেই থমকে গেল। তারপর কারও নিষেধ না শুনে দৌড়ে নেমে চলল 'চমৎকার' হাড়টা তুলে আনবার জন্যে।

'মহিলাকে খুশি দেখে ভালই লাগল,' মিশা বলল। 'কিন্তু ছেলেটা ভারি অদ্ভুত, টুকি। স্কুলে যাওয়া উচিত ওর। একা একা থেকে আরও ওরকম হয়েছে। বয়েসও তো কম হয়নি, আট, কয়েকটা ক্লাস শেষ করে ফেলার কথা এতদিনে।

খালাকে বলব। দেখি কিছু করতে পারে কিনা।'

'এই টিটু, জলদি উঠে আয়,' কড়া গলায় ধমক লাগাল কিশোর। 'ফেল! এত খাস, তবু মন ভরে না! পচা এক হাড় দেখে পাগল হয়ে গেছিস! এ-জন্যেই তোদের নাম কুত্তা!'

চোদ্দ

আরও দুটো দিন গেল এই দুদিন সবাই খুব ব্যস্ত থেকেছে লধশরা, ঘরের কাজে। নিজেদেরও কিছু জরুরি ব্যক্তিগত কাজ ছিল, সেগুলোও সেরেছে। মুরগীর খোঁয়াড়টা পরিষ্কার করে ফেলেছে মিশা আর কিশোর। সাহায্য করতে গিয়ে বরং বার বার ওদের কাজে বাধারই সৃষ্টি করেছে টিটু।

তবে দুদিনে কয়েকবারই দেখা হয়েছে সকলের। চোরাই বেহালাটা নিয়ে আলোচনা করেছে।

'মনে হচ্ছে ব্যাপারটা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাচ্ছে না কেউ,' রবিন বলেছে। 'পুলিশকে জিজ্ঞেস করেছিলেন বাবা। ওরা বলল কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।'

'নিয়ে পালিয়েছে,' বব বলল, 'আর কি পায়? এতক্ষণে গিয়ে দেখো কয়েকশো মাইল দূরে গিয়ে বসে আছে চোরটা।'

এ-রকম কথাবার্তা হয়েছে ওদের মাঝে, কাজের কাজ কিছু এগোয়নি।

মুরগীর খোঁয়াড় পরিষ্কার শেষ করে মিশা আর কিশোর ঠিক করল, আপাতত আর কোন কাজ করবে না।

'চাচী,' মেরিচাচীকে বলল কিশোর, 'আজ বেড়াতে বেরোব। খাবার-টাবার কিছু আছে?'

'স্যান্ডউইচ বানিয়ে দিচ্ছি, নিয়ে যা,' চাচী বললেন। 'টমের নামে একটা চিঠি এসেছে। গিয়ে দিয়ে আসিস।'

'আচ্ছা,' কিশোর বলল। 'বনের দিকে যাব আমরা। খুব সুন্দর ব্লুবেল ফুল নাকি ফুটেছে শুনলাম, দেখতে যাব। পিকনিকটা ওখানেই সারব। তারপর পাহাড়ের দিকে গিয়ে দিয়ে আসব টমের চিঠি।'

'জ্যাকের বউকেও দেখে আসব,' মিশা বলল, 'ওকে কয়েকটা জিনিস দেবার কথা বলে এসেছি। সুঁই-সুতো, কাঁচি। আর একটা বালতি। আছে নাকি, খালা?'

'বালতিই তো নেই। দেখি পাওয়া যায় কিনা। না পেলে আর কী করা।'

বেরিয়ে পড়ল কিশোররা। আগে আগে পথ চলেছে টিটু। সুন্দর একটা দিন। জুনের মতই গরম আবহাওয়া, ঝকঝকে রোদ। সবখানে প্রিমরোজ ফুলের

...ড়। খানাখন্দের ছায়াঢাকা কোণগুলোতে বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে বুনো ...নিমোন, যেন আরাম পেয়ে তন্দ্রায় ঢুলছে।

...নের ভিতরে পরিবেশ আরও চমৎকার। যেখানে সেখানে ফুটে রয়েছে ...েল। ওগুলোর লম্বা সবুজ কাঁটাগুলো এমনভাবে ঘিরে রেখেছে, যেন কড়া ...হারা দিচ্ছে ফুলগুলোকে, যাতে কেউ ছিঁড়তে না পারে। একটা বড় ফুল দেখে ...ো অনেকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইল মিশা, এত নীল ওটার পাপড়ি। তারপর ...লল, 'সাদা ফুল এবার খুব কম। একটাও দেখছি না।'

'পেলে কী হবে?' কিশোর বলল। 'বাড়িতে তো আর নিয়ে যেতে পারবে না। ...লেই মরে যায়।'

'জানি। এত নাজুক, তাজা রাখাই মুশকিল।'

বনের মধ্যেই লাঞ্চ সারতে বসল ওরা। মাথার উপরে গান ধরেছে ব্ল্যাকবার্ড আর থ্রাশ। খাবারের গন্ধ পেয়ে ফুড়ুৎ করে উড়ে এসে ওদের পায়ের কাছে বসল একটা রবিন। ওকে রুটির ছোট একটা টুকরো দিল মিশা। সেটা ঠোঁটে নিয়েই আবার ঝোপের ভিতরে গায়েব হয়ে গেল পাখিটা।

খাওয়া শেষ করে আরও কিছুক্ষণ ফুল দেখল ওরা। তারপর রওনা হলো পাহাড়ের দিকে, যেখানে রয়েছে টমের কুঁড়ে।

টম বাড়ি নেই। দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে চিঠিটা ফেলে দিল কিশোর। তারপর চলল ক্যারাভানের দিকে। ওটাও বন্ধ। কাউকে চোখে পড়ল না। এমন কী টুকিও নেই।

'ভেড়া চরাতে গেছে বোধহয় টম,' ঘাসের ওপর বসে পড়ে বলল কিশোর। 'পাহাড়ের ওপাশে।'

'জানো, কিশোর,' মিশা বলল, 'আমার না খুব রাখাল হতে ইচ্ছে করে।'

'মাথায় ছিট আছে আরকি...ওই যে, টম আসছে' পাহাড়ী পথের দিকে হাত তুলল কিশোর। 'ওর কুকুরটাও আছে সঙ্গে।'

কাছে এল টম। ছেলেমেয়েদের দেখে হাসল। মাঝে মাঝে ভেবে অবাক লাগে মিশার, খোলা অঞ্চলে যারা চিরকাল বাস করে তাদের চোখ নীল হয় কেন? লোকটার দিকে এগিয়ে গেল সে।

'তোমরা এসেছ আমার সঙ্গে দেখা করতে,' হাতের বড় লাঠিটায় ভর দিয়ে দাঁড়াল টম, 'খুশি হলাম। আমার কাছে আসেটাসে না কেউ।'

চিঠি রেখে আসার কথা বলল মিশা।

'কিন্তু আজকাল নিশ্চয় আর একা থাকতে হয় না আপনাকে,' বলল কিশোর। 'জ্যাকেরা আছে কাছাকাছি।'

'তা আছে। মিসেস মারফি খুব ভাল মানুষ। তবে তার স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়নি একদিনও। রোজ অনেক রাতে বাড়ি ফেরে। মেলায় কাজ করে তো, রাত

হবেই ওদের ছেলেটাও ভারি অদ্ভুত, টুকি। কখন যে কী করবে ঠিক-ঠিকানা নেই কখনও হয়তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা একভাবে বসেই কাটিয়ে দিল। আমার মনে হয় মাথায় গোলমাল আছে।'

'তাই!' মিশা বলল। 'সে-জন্যেই বোধহয় তাকে স্কুলে পাঠাতে সাহস পায় না তার মা।'

'তবে ছেলেটাকে দেখলে আদর করতে ইচ্ছে করে। কতবার কাছে ডেকেছি, আদর করে বসিয়ে গল্প শোনানোর জন্যে। কিন্তু কাউকে দেখলেই ভয়ে ছুটে পালায়। হঠাৎ কোন শব্দ শুনলেও ভয় পেয়ে যায়। কাল রাতেও পেয়েছিল কিনা কে জানে।'

'কি হয়েছিল কাল রাতে?' ভুরু কুঁচকাল কিশোর।

'কী যে হয়েছিল আমিও ঠিক বলতে পারব না। ঘরে শুয়েছিলাম, ঘুম পেয়েছে, এই সময় কানে এল শব্দটা। তখন সাড়ে ন'টা হবে। অন্ধকার রাত। হঠাৎ শোনা গেল চিৎকার···হ্যাঁ, চিৎকারই বলা যায়! নাকি কান্না বলব? কী জানি, শব্দটা কী রকম ঠিক বোঝাতে পারছি না। তীক্ষ্ণ শব্দটা বাড়তেই লাগল, বাড়তেই লাগল, মনে হলো কোন জানোয়ার যন্ত্রণায় চিৎকার করছে, অথচ জ্যান্ত মনে হলো না আওয়াজটা। শেষে আর থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম কে ওরকম করছে। থেমে গেল শব্দ।'

অবাক হয়ে গল্পটা শুনল কিশোর আর মিশা। চিৎকার? কিসের চিৎকার? আর চিৎকারই যদি হবে, জ্যান্ত হবে না কেন?

'শব্দ একবার বাড়ছিল, একবার কমছিল,' আবার বলল টম। 'ওরকম শব্দ জীবনে শুনিনি। উঠে এসে যেন আমার কলজে চিপে ধরতে লাগল। বন্ধ হওয়ায় বাঁচলাম।'

'আজ রাতেও হবে মনে হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মাথা নাড়ল টম। 'কি করে বলি? সকালে মিসেস মারফিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলল, কিছু শোনেনি। কিন্তু আমি শুনেছি, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

পাইপ আনতে চলে গেল টম।

মিশাকে বলল কিশোর, 'আজ রাতে আমি আর মুসা আসব চিৎকার শুনতে। রহস্যময় লাগছে আমার কাছে ব্যাপারটা। সত্যিই যদি শোনা যায় আবার, জানার চেষ্টা করব কিসের আওয়াজ।'

পনেরো

ফেরার পথে মুসার সঙ্গে দেখা করল কিশোর। বাগানে নিনা আর বাবলিও

রয়েছে। কিশোর বলল, 'মুসা শুনে যাও, খবর আছে।'

'কি খবর?' জিজ্ঞেস করল বার্বলি।

'সেটা লধশদের নিজস্ব ব্যাপার,' শীতল গলায় জবাব দিল কিশোর। 'তোমার শোনার দরকার নেই।'

কিশোরকে নিয়ে একটা ঘরে চলে এল মুসা শুনল সব।

'নিশ্চয়ই খোয়াব দেখেছিল টম,' মুসা বলল।

'আমার তা মনে হলো না।'

'তাহলে কী করতে বলো?'

'আজ রাতে দেখতে যাব।'

আলোচনা করে ঠিক করল দুজনে, রবিন আর ববকেও সঙ্গে নেবে। মেয়েরা বাদ।

'আমাদের গেটে দেখা করবে,' কিশোর বলল। 'আর টর্চ আনবে সাথে করে। চাঁদ থাকবে না। আকাশে মেঘ থাকলে তো আরও অন্ধকার হয়ে যাবে।'

'আচ্ছা।'

বাইরে বেরোতেই খিলখিল হাসি শোনা গেল। থমকে গেল কিশোর। 'আড়ি পেতে শুনছিল নাকি আমাদের কথা?'

'শুনলে শুনুকগে,' হাত নাড়ল মুসা। 'কে কেয়ার করে?'

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ যখন অন্ধকার হয়ে গেল, কিশোরদের বাগানের গেটে মিলিত হলো চার কিশোর। বাড়ি থেকে অনুমতি মিলেছে। মিশাও রয়েছে ওখানে। শেষবার অনুরোধ করল কিশোরকে, 'কিশোর, সত্যি নেবে না আমাকে?'

'না, এ-সব রাতের অভিযানে মেয়েদের যাওয়া উচিত না।'

নিরাশ হয়ে ঘরে ফিরে গেল মিশা।

টিটুকেও সাথে নেওয়া হলো না, অহেতুক চেঁচামেচি করে সব নষ্ট করবে ভেবে।

সোজা টমের কুঁড়ের কাছে চলে এল ওরা।

'আমরা এসেছি ওকে জানানো যাবে না,' ফিসফিসিয়ে বলল কিশোর। 'ঘরে আছে কিনা এখন তাই বা কে জানে। চলো ঝোপের মধ্যে গিয়ে বসে থাকি।'

'ভিতরে তো আলো আছে,' বব বলল। 'ঘরেই আছে মনে হচ্ছে।'

কাছেই একটা বড় ঝোপের ভিতরে লুকিয়ে রইল চারজনে। আচমকা একটা পেঁচার কর্কশ চিৎকারে চমকে গেল। তারপর আবার নীরবতা। কান খাড়া করে রেখেছে ওরা রহস্যময় শব্দ শুনবার আশায়।

হয় না, হয় না, তারপর হঠাৎ করেই শুরু হলো বিচিত্র শব্দ।

ধড়াস ধড়াস শুরু করল ছেলেদের বুক। একে অন্যের হাত খামচে ধরল ওরা।

'আমাদের পিছনে!' ফিসফিসিয়ে বলল কিশোর। 'এসো, ওপাশ থেকে ঘুরে গিয়ে দেখি।'

গায়ে টর্চের আলো পড়তেই হি-হি করে হেসে উঠল বাবলি আর নিনা।

'কী মিয়ারা?' টিটকারি দিল বাবলি, 'চিৎকারটা কেমন লাগল? খুব মজা?'

ঘুসি পাকিয়ে এগোতে যাবে মুসা, এই সময় ঝোপের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল আরেকটা লম্বা মূর্তি। টম। 'এই, কী হচ্ছে এখানে? এ-রকম চেঁচামেচি করছ কেন?'

'আর বলবেন না, এই বাবলি আর নিনাটার শয়তানী!' মুসা বলল। 'কাল রাতেও ওরাই করেনি তো?'

'না,' মাথা নাড়ল টম। 'কাল রাতে অন্য রকম শব্দ হয়েছিল।'

মুসার কিলের ভয়ে পালিয়ে গেল বাবলি আর নিনা।

'তোমরাও যাও,' ছেলেদের বলল টম। 'যা শব্দ না! শুনলে ভিরমি খাবে। ওদের মতই লেজ গুটিয়ে পালাবে তখন।' বলে কুঁড়ের দিকে রওনা হয়ে গেল সে।

'ওই বাবলিটার কথা আর কী বলব!' ফুঁসে উঠল বব। 'এত্তো শয়তান মেয়ে আমি আর দেখিনি! নিশ্চয় তোমরা যখন কথা বলছিলে, আড়ি পেতে সব শুনেছে।'

'হ্যাঁ,' কিশোর বলল।

'এখন আর থেকে কী হবে?' রবিন বলল। 'বাড়ি চলে যাব?'

'না। আরেকটু অপেক্ষা করে দেখি। টম বলেছে, সাড়ে ন'টার দিকে শুনেছিল শব্দটা। তারমানে এখনও সময় আছে।'

'ঠিক আছে। আর পাঁচ মিনিট। তারপরেই আমি উঠব।'

গাঢ় অন্ধকারে আবার চুপ করে বসে রইল ওরা। আকাশে মেঘ করেছে। একটা তারাও চোখে পড়ে না কোথাও। আরেকবার ডেকে উঠল পেঁচা। পিছনের ঝোপের পাতায় মৃদু শিহরণ তুলে সড়সড় করে চলে গেল একঝলক বাতাস। কাছেই একটা ঝোপে ডেকে উঠল একটা নিশাচর পাখি, একবার ডেকেই চুপ হয়ে গেল ওটা।

'নাহ্, আর বসে থাকার কোন মানে হয় না,' কিশোর বলল। 'চলো যাই। আজ আর হবে না...'

কথা শেষ হলো না তার। অদ্ভুত একটা শব্দ যেন চিরে দিল স্তব্ধ নীরবতাকে। চমৎকার মিহি সুর, ধীর লয়ে হচ্ছে আওয়াজটা।

আশ্চর্য রকম ভাবে থামিয়ে দিয়েছে যেন আর সব শব্দ। বেজেই চলেছে, বেজেই চলেছে, ছেলেদের মনে হলো বাতাসও কান পেতে শুনছে ওই শব্দ।

টমের দরজা খোলার আওয়াজ হলো। নিশ্চয় ঘুমোয়নি সে। কানে গেছে শব্দ।

নিঃসঙ্গ পাহাড়ের কোলে এই ছড়ানো প্রান্তরে যেন ছড়িয়ে পড়েছে করুণ কান্নার স্বর। মিষ্টি, হৃদয় ছুঁয়ে যায়, কিন্তু কেন যেন খারাপ করে দেয় মনটা।

'বেহালা!' ফিসফিস করে বলল বব 'আমি শিওর! কিন্তু এত সুন্দর বাজনা আর শুনিনি। এই পাহাড়ের মধ্যে অন্ধকার রাতে কে বাজাচ্ছে বলো তো?'

চিৎকার করে উঠল রবিন, 'এই কে? কে শব্দ করে? জলদি বেরিয়ে এসো!'

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল বাজনা। আর একবারও হলো না বেহালার শব্দ।

কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে আবার ঘরে ফিরে গেল টম। দরজা লাগিয়ে দিল।

'আমার বিশ্বাস, কিশোর বলল, 'আমার বিশ্বাস, এটা সেই চোরাই বেহালা! কী সুন্দর বাজাল! আর টম বলছিল, চিৎকার। না বুঝে যে কত উল্টোপাল্টা কথা বলে মানুষ!'

'আমার কাছে দারুণ লাগল, বুঝলে,' রবিন বলল। 'কিন্তু বাজাল কে?'

'জ্যাক মারফি!' কিশোর বলল।

'কীভাবে বুঝলে?' ববের প্রশ্ন।

'সে মিউজিক ভালবাসে। একটা ব্যাঞ্জো ছিল, বাজাত। ওটা পুড়ে যাওয়ার পর বাজানোর মত আর কিছু না পেয়েই হয়তো বেহালাটা চুরি করেছে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল কিশোর, 'এখন আমাদের কাজ বেহালাটা খুঁজে বের করা। জ্যাক চুরি করে থাকলে নিশ্চয় ক্যারাভানে লুকিয়ে রাখে। কিন্তু এখন ক্যারাভানে গিয়ে লাভ নেই। পাহাড়ের ওদিক থেকে এসেছে বাজনা, তারমানে জ্যাক এখন নেই ক্যারাভানে। চলো, ওদিকে আছে। টর্চ জ্বালবে না, খবরদার।'

'পাহাড়ের ওদিকে গিয়ে কী করব?' প্রশ্ন তুলল মুসা। 'বাজনা থেমেছে অনেকক্ষণ। জ্যাক হয়তো এখন ক্যারাভানে ফিরে গেছে ঘুমানোর জন্যে। গেলে ক্যারাভানের দিকেই যাওয়া উচিত আমাদের।'

কথাটা ভেবে দেখল কিশোর। 'তা, মন্দ বলোনি। ভয় পেয়ে যখন থামিয়ে দিয়েছে বাজানো, আজ রাতে আর বাজাবে বলে মনে হয় না। চলো, ক্যারাভানেই দেখি।'

অন্ধকারে পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল চার কিশোর। ক্যারাভানের ভিতরে কি জ্যাককে দেখতে পাবে? পাবে চোরাই বেহালাটা?

ষোলো

এত অন্ধকার, প্রথমে ক্যারাভানটা দেখতেই পেল না ওরা।

আবছা মত কিশোরের চোখে পড়ল আগে ওটা থমকে দাঁড়াল সে তার গায়ের ওপর এসে পড়ল মুসা

'ভিতরে কেউ আছে বলে তো মনে হচ্ছে না,' ফিসফিসিয়ে বলল রবিন। 'একেবারে অন্ধকার।'

'আশ্চর্য!' বলে আগে বাড়ল কিশোর।

নীরব ক্যারাভানটার পাশে এসে দাঁড়াল ওরা সামান্য আলোও চোখে পড়ছে না। কান পেতে শুনছে কিশোর। ভিতরে শব্দ শোনা যাচ্ছে।

'কেউ কাঁদছে!' বব বলল। 'ছোট মানুষের গলা মনে হয়...

'টুকি।' কিশোর বলল। 'ওকে একা ফেলে চলে গেছে হয়তো সবাই. ভয় পাচ্ছে বেচারা।' টর্চ জ্বেলে ক্যারাভানের সিঁড়িতে পা রাখতে যাবে সে, এই সময় চমকে দিল একটা কণ্ঠ।

আলো দেখে আবার এসেছে টম। কাছে এসে বলল, 'ও, তোমরা। এখনও যাওনি? কী যে করছ এখানে বুঝি না! আমি তো ভাবলাম না জানি আবার কে এল।'

'টম, কিসের শব্দ বুঝতে পেরেছি,' কিশোর বলল। 'বেহালা। কেউ বেহালা বাজিয়েছে।'

এক মুহূর্ত নীরব হয়ে রইল টম। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'বেহালা!...কখনও শুনিনি তো, তাই চিনতে পারিনি! দুনিয়াতে আমার মত বোকা মানুষও আছে তাহলে!' আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে চলে গেল সে।

ক্যারাভানের ভিতরে থেমে গেছে কান্নার শব্দ।

'এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই,' কিশোর বলল সঙ্গীদের। 'আজ রাতে আর খুঁজতে পারব না, টুকি রয়েছে ভিতরে। চলো, যাই।'

বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে একসময় বলল সে, 'কিছুই বুঝতে পারছি না, বুঝলে। পাহাড়ের ওদিকে কোথাও থেকে বেহালা বাজিয়েছে জ্যাক। কেন? জ্যাক আর তার বউ ক্যারাভানে নেই দেখে অবাক হয়নি টম, তারমানে সে জানে ওরা কোথায় আছে। হয়তো মেলায় চলে গেছে দুজনেই, ছোট বাচ্চাটাকে নিয়ে। টুকিকে একা ফেলে গেছে ক্যারাভান পাহারা দেয়ার জন্যে। কিন্তু তাহলে এত রাতে জ্যাক কেন পাহাড়ে ফিরে এল অন্ধকার রাতে বেহালা বাজানোর জন্যে?'

'আমারও মাথায় কিছু ঢুকছে না,' রবিন বলল। 'তবে একটা ব্যাপারে আমি শিওর এখন, জ্যাকই চুরি করেছে বেহালাটা। তার ব্যাঞ্জো পোড়ার দুঃখ ঘোচানোর জন্যে।'

'লুকাল কোথায় ওটা?' ববের প্রশ্ন।

'হয়তো ক্যারাভানের ভিতরেই কোথাও,' কিশোর বলল। 'কাল আবার আসব। খালি থাকলে তো ভালই। না থাকলেও কোন একটা ছুতো করে ভিতরে

পরদিন। সকালে লধশরা সবাই দল বেঁধে এল পাহাড়ের ধারে প্রথমে উঁকি দিল চিমেন মারে। সে নেই। কুকুরটাও নেই। নিশ্চয় ভেড়া চরাতে চলে গেছে পাহাড়ের অন্যপাশে।

ক্যারাভানের কাছে চলে এল ওরা।

'মিসেস মারফি?' ডাকল কিশোর। সাথে করে বিস্কুট আর মাখন নিয়ে এসেছে দেওয়ার জন্য।

সাড়া নেই।

প্র্যামটা কোথাও দেখতে পেল না মিশা। বাচ্চাটাকে আদর করতে না পারায় কিছুটা হতাশই হলো সে।

'দরজায় তালা লাগানো নেই তো?' নিজেকেই যেন প্রশ্নটা করে সিঁড়ি বেয়ে দরজার কাছে উঠে গেল কিশোর। দরজায় থাবা দিয়ে আবার ডাকল, 'মিসেস মারফি, আছেন?'

জবাব মিলল না দেখে দরজায় ঠেলা দিল সে। খুলে গেল পাল্লা। সঙ্গীদের দিকে ফিরে চোখ টিপে ইশারা করে বলল, 'তোমরা থাকো। আমি বিস্কুট আর মাখনের টিন রেখে আসি।'

ক্যারাভানের ভিতরে তন্ন তন্ন করে খুঁজল কিশোর, কোথাও পাওয়া গেল না বেহালাটা।

হঠাৎ বাইরে শোনা গেল মিশা আর মুসার চিৎকার।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল কিশোর। দেখল, সবাই উঁকি দিয়ে দেখছে ক্যারাভানের তলায়।

'কিশোর, দেখে যাও কী পেয়েছি!' মিশা বলল।

কিশোরও দেখল। ক্যারাভানের তলার একটা ভাঙা তক্তার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে কতগুলো পুরানো কাপড়। কাকতাড়ুয়ার পরনে যেগুলো ছিল।

বেহালাটা ক্যারাভানের তলায়ও কোথাও পাওয়া গেল না।

'না, এখানে নেই,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর 'পাহাড়ের ওদিকে যেখানে বাজায়, সেখানেই কোন ঝোপের মধ্যে রেখেছে।'

'তাহলে তো খুঁজে পাওয়া মুশকিল,' রবিন বলল। 'ক'টা ঝোপে খুঁজব?'

এই সময় দেখা গেল, প্র্যাম ঠেলতে ঠেলতে আসছে জ্যাকের বউ সাথে একজন পুরুষ মানুষ। নিশ্চয় জ্যাক মারফি।

কাছে এসে জ্যাকের বউ বলল, 'ও, তোমরা তা কী মনে করে?'

'কিছু খাবার নিয়ে এসেছি,' কিশোর বলল 'কোথায় ছিলেন সারারাত?'

'মেলায়। খাবার বিক্রি করেছি। আরেকটা ঘর তোলার জন্যে টাকা দরকার

আমাদের। কাজেই দুজনেই পরিশ্রম করছি

'ভাল, বলে চাকার কাছে বসে পড়ল কিশোর ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে টেনে বের করল কাপড়ের পোঁটলাটা। স্বামী-স্ত্রীর চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। ওদেরকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল সে, 'এগুলো এখানে কে রেখেছে?'

রেগে গেল জ্যাক। চোখ দুটো দেখাচ্ছে ঠিক তার ছেলের মত, শূন্য। বলল, 'আমরা কি জানি!'

'জানেন তো নিশ্চয়ই,' রবিন বলল। 'কারণ এগুলো পরে গিয়েই বেহালাটা চুরি করে এনেছেন দোকানের জানালা ভেঙে।'

রেগে উঠে আরেকটা জবাব দিতে যাচ্ছিল জ্যাক, বাধা দিল তার বউ, 'ওসব বলে লাভ হবে না, জ্যাক। চুপ করো। পুলিশের কাছে মিথ্যে বলে পার পাবে না। সব স্বীকার করে নেয়াই ভাল।' চোখ ছলছল করে উঠল মহিলার। 'এবার আর জেলখাটা তোমার ঠেকাতে পারবে না কেউ!'

কোমল গলায় জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কেন করলেন এই কাজ? টাকার জন্যে?'

চোখ মুছে নিয়ে মহিলা বলল, 'না, টাকার জন্যে নয়।'

'বাজনা বাজানোর খুব শখ, সেজন্যে?' রবিন বলল। 'ব্যাঞ্জোটা পুড়ে যাওয়ায় বাজানোর জন্যে ওটা এনেছেন?'

'বাজানোর শখ ঠিকই,' মহিলা বলল, 'তবে জ্যাকের না। টুকির।'

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল লধশরা।

অবশেষে কথা ফুটল মিশার মুখে, 'তারমানে…তারমানে কাল রাতে পাহাড়ে টুকি…নাহ্, বিশ্বাস করতে পারছি না…'

'আমিও না! ওই সুর টুকি বাজিয়েছে! আশ্চর্য!'

'হ্যাঁ, বাবা,' টুকির মা বলল, 'টুকিই বাজিয়েছে। দাঁড়াও, ডাকছি।'

টুকির নাম ধরে কয়েকবার ডাকতেই ঝোপের ভিতর থেকে উঁকি দিল ছেলেটা। তার মা বলল, 'যা, বেহালাটা বের করে নিয়ে আয়।'

ঝোপের ভিতরে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল টুকি। বেরিয়ে এল কয়েক মিনিট পর। হাতে বেহালা। ভয়ে কাঁপছে।

'বাজিয়ে শোনা তো ওদেরকে,' অভয় দিয়ে বলল তার মা।

শূন্য দৃষ্টিতে লধশদের দিকে তাকাল টুকি। কিন্তু কার দিকে তার নজর, ঠিক বোঝা গেল না। তারপর ওদের দিকে পিছন ফিরে বেহালা ঠেকাল কাঁধে। তারের উপর ছড় লাগিয়ে আস্তে করে টান দিল।

ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল অপূর্ব মূর্ছনা। বাতাসের কানাকানি, পাখির কাকলি, সব কিছু ঢেকে দিয়ে বাজছে বেহালা। করুণ সেই সুর শুনে স্থির থাকতে পারল না মিশা, চোখে পানি এসে গেল তার মনে হলো, বেহালার বাজনা নয়,

[illegible] মনের ব্যথা ফেটে বেরিয়ে আসছে তার বেয়ে, কান্নার মত

অনিতা আর ডলি স্তব্ধ হয়ে গেছে চুপ হয়ে গেছে ছেলেরাও। বিশ্বাসই করতে পারছে না, আট বছরের একটা বাচ্চা ছেলে এ-রকম বেহালা বাজাতে পারে।

'কি, এবার বিশ্বাস হলো তো?' টুকির মায়ের মুখে হাসি, চোখে পানি।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল রবিন।

'রাতের বেলা টুকিই তাহলে পাহাড়ে গিয়ে বেহালা বাজিয়েছিল,' আনমনে বিড়বিড় করল বব।

টুকি কিছু বলল না। তার মা বলল, 'রাতে একা একা বসে বাজনা বাজাতেই পছন্দ করে ও।'

'ও তো একটা জিনিয়াস!' মিশা বলে উঠল। 'স্কুলে পাঠান না কেন ওকে? পড়ালেখার সঙ্গে সঙ্গে আরও ভাল বাজনা শিখতে পারবে।'

ব্যথায় কুঁকড়ে গেল মায়ের মুখ। 'কী করে পড়বে, বলো? আমার ছেলেটা যে চোখে দেখতে পায় না। অন্ধ।'

আরেকবার স্তব্ধ হওয়ার পালা লধশদের। এতক্ষণে বুঝতে পারল টুকির চোখের ওরকম নিষ্প্রাণ চাহনির কারণ।

'দুনিয়ায় একমাত্র বাজনাই ওকে শান্তি দেয়, সুখ দেয়,' কান্না জড়ানো গলায় বলল বিষণ্ন মা। 'আগে একটা বেহালা ছিল ওর। ওটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর অনেক কষ্টে কিছু টাকা জোগাড় করে পুরানো একটা ব্যাঞ্জো কিনে দেয় ওর বাবা। ঘরে আগুন লেগে ওটাও পুড়ে গেলে একেবারে বোবা হয়ে যায় টুকি। আরেকটা যন্ত্র কিনে দেয়ার টাকা নেই ওর বাবার। ছেলের কষ্ট সইতে না পেরেই বেহালাটা চুরি করে আনে সে।'

চুপ করে আছে লধশরা। কী বলবে?

অনেকক্ষণ পর টুকির মা বলল, 'এখন তো সব শেষ। জ্যাক যাবে জেলে। বেহালাটাও নিয়ে যাবে দোকানদার। আর আমাদের কোন উপায় নেই!'

সতেরো

কিশোরদের বাড়ি ফিরে এল লধশরা। মেরিচাচী আর রাশেদ পাশাকে সব খুলে বলল ওরা।

'চাচী, কী করব বুঝতে পারছি না,' কিশোর বলল। 'দোকানদার বেহালাটা নিয়ে যাবে। জ্যাক যাবে জেলে। টুকির কী হবে? তার মায়ের আর ছোট বোনটার কী হবে? টুকির মত এ-রকম একটা প্রতিভা নষ্ট হয়ে যাবে?'

'ওদের জন্যে আমারও খারাপ লাগছে,' রাশেদ পাশা বললেন 'কিন্তু কী করা যায়?'

মিনিটখানেক চুপচাপ ভাবলেন তিনি তারপর বললেন, 'দোকানদারের সঙ্গে আমার খাতির আছে বেহালাটা ফেরত পেলে, আর সে যদি পুলিশকে রিপোর্ট না করে, অভিযোগ তুলে নেয়, তাহলে জ্যাককে জেলে পাঠাবে না পুলিশ।'

'তাই করুন, আঙ্কেল,' বলে উঠল ডলি। 'ওদের জন্যে এত খারাপ লাগছে না!'

'হ্যাঁ, জ্যাককে দোষ দেয়া যায় না,' আনমনে বললেন রাশেদ পাশা। 'ওর অবস্থায় পড়লে হয়তো আমিও এ-রকম কিছুই করে বসতাম। ঠিক আছে, দেখি, বলব। দোকানদারকে ম্যানেজ করব আমি।'

খুশিতে হৈ-চৈ করে উঠল ছেলেমেয়েরা। এমনকি টিটুও চুপ রইল না। মেঝেতে লেজের বাড়ি মারতে মারতে 'হুফ! হুফ!' করে উঠল সে।

'টুকির কী হবে?' মিশা প্রশ্ন তুলল।

'ওর ব্যাপারটা আমি দেখব,' কথা দিলেন মেরিচাচী। 'ওকে অন্ধ স্কুলে পাঠানোর ব্যবস্থা করব। ওখানে তার বাজনা শেখারও অসুবিধে হবে না।'

আরেকবার হুল্লোড় করে উঠল ছেলেমেয়ের দল। ওদের কাছে মনে হয়েছিল, এই জটিলতা থেকে বুঝি মুক্তি নেই। কিন্তু কত সহজে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল! যা ভাবতেই পারেনি ওরা। বড়রা অনেক কিছু করতে পারে।

'বাজনা শিখতে তো অসুবিধে হবে না, বুঝলাম,' কিশোর বলল, 'কিন্তু শিখবে কী দিয়ে? বেহালাটা তো নিয়ে যাবে ওর কাছ থেকে।'

হাসলেন মেরিচাচী। 'তাতে কী? কাল ওকে নিয়ে যাব একটা মিউজিক শপে। ওর পছন্দ মত বেহালা কিনে দেব, ছোটদের মাপমত বানানো। চুরি করে যেটা নিয়েছে সেটা ওর জন্যে বড়, বাজাতে বরং অসুবিধে। ছোট পেলে আরও ভাল বাজাতে পারবে। তবে একটা শর্ত আছে। আমাদেরকে কিন্তু বাজিয়ে শোনাতে হবে।'

মেরিচাচীর কথায় সবাই খুশি। ঘর থেকে বেরিয়ে এল লধশরা।

রবিন বলল, 'এখন কী করব? বাড়ি ফিরে যাব?'

'না,' কিশোর বলল। 'খুশির খবরটা টুকি আর তার বাপ-মাকে দিয়ে আসতে হবে না?'

'ঠিক! ঠিক!' বলে উঠল সবাই।

দল বেঁধে আবার পাহাড়ের দিকে রওনা হলো ওরা।

-: শেষ :-